সেবকের নিবেদন

অর্থাৎ

শ্রীমদাচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের

উপদেশ।

পঞ্চম খণ্ড।

চতুর্থ সংস্করণ।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮৩৭ শক, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ॥০ আনা।

সেবকের নিবেদন

অর্থাৎ

শ্রীমদাচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের

উপদেশ।

পঞ্চম খণ্ড।

চতুর্থ সংস্করণ।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮৩৭ শক, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ৷৹ আনা।

কলিকাতা।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

বিধান প্রেস।

আর, এস, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী পত্র।

ॐ

সেবকের নিবেদন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভাদ্রোৎসব।

স্নান ও ভোজন।

রবিবার ১২ই ভাদ্র, প্রাতঃকাল, ১৮০৪ শক;

২৭শে আগষ্ট ১৮৮২।

ধর্ম্ম অত্যন্ত সহজ এবং ধর্ম্ম অত্যন্ত কঠিন। ধর্ম্ম পৃথিবীর প্রশস্ত পথে ধূলির ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, লইলেই হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত; বহু কষ্টে তাহা উপার্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু সহজে, খুব সহজে ঈশ্বরকে বুঝিতে পারা যায়। অনেক শাস্ত্র পড়িয়া জ্ঞানমার্গ মন্থন করিলে অবশেষে অমৃত পাওয়া যায়; নিশ্বাস ফেলিলে যেমন কষ্ট হয় না, আরাম হয়, তেমনই সহজে আরামে ব্রহ্মদর্শন হয়।

বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করিলে তার পর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয়, চিন্তা শুদ্ধ হয়, মন যোগাসনে আসীন হইয়া আপনার ইষ্ট দেবতাকে যোগাসনে দর্শন করে, এই কথাই অনেকে জানেন,

কিন্তু ধর্ম্ম যে সহজ, প্রথমে আদি মনুষ্য বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। বহু শতাব্দীর ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনার পর উচ্চ ভাবের সিদ্ধ সাধক ধর্ম্মকে সহজ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনেক চিন্তা করিলাম, ধর্ম্ম যে সহজ, এ চিন্তাকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। অনেক দেশ ঘুরিলাম, ধর্ম্মের নানাপ্রকার রাজ্য ভ্রমণ করিলাম, ঘরে আসিয়া বহু সুখে রাশ রাশি রত্ন পাইলাম। বেড়াইয়া পাইলাম, ঘরেও পাইলাম। বহু সাধনের পর বুঝিলাম ধর্ম্মকে আগে যত সহজ মনে করিতাম, তদপেক্ষাও সহজ। নিশ্বাসের সঙ্গে আগে ইহার উপমা হইত; নিঃশ্বাস অপেক্ষা যদি কিছু সহজ ব্যাপার থাকে, তদপেক্ষাও ধর্ম্মকে এখন সহজ বোধ হইতেছে।

ধর্ম্ম চিন্তা দ্বারা, সাধন দ্বারা আয়ত্ত করিয়া দেখিলাম, ধর্ম্মের মূল মন্ত্র কেবল স্নান ও ভোজন। বিস্ময়াপন্ন হইও না; ধর্ম্মকে অতি সহজ শুনিয়া ভীত হইও না। অদ্ভুত কথা এই তত্ত্বরস সাগর মধ্যে লব্ধ হইবে। ধর্ম্ম আর কিছু নয়. কেবল স্নান ও ভোজন। সমস্ত বিধান ও সমস্ত প্রেরিত পুরুষের সার কথা স্নান ও ভোজন। পরিস্কৃত হও, ও পরিতুষ্ট হও, এই দুই কথার মধ্যে যাবতীয় শাস্ত্র, স্বজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত শাস্ত্র, নিহিত আছে। সহজ ধর্ম্ম উপলব্ধি ও সাধন করিতে চেষ্টিত হও। নববিধানবাদী, সহজ পথ ধারণ কর; একটীবার স্নান ও ভোজন করিলে মনুষ্য স্বর্গারোহণ করে।

হিন্দুস্থানে হিন্দু প্রত্যহ যে স্নান ও ভোজন করেন, বুঝিতে পারুন আর না পারুন, তিনি মহোচ্চ কার্য্য করেন। স্নান না করিয়া হিন্দুর দিন যায় না; আহার না করিয়া তাঁহার দিবাবসান হয় না। কে তোমাকে শৈশবে স্নান করিতে শিক্ষা দিল? কে তোমাকে অন্ন আহারে সুমতি প্রদান করিল? পৃথিবীর ধূলিরাশি ও উত্তাপের মধ্যে কে স্নান করিতে বলিল? শরীরের জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হইলে কে খাইতে বলিল? বলবতী পিপাসা ভয়ানক নির্যাতন করিলে কে জলপানে মতি দিল? স্পৃহা তোমার গুরু; অভাববোধ তোমার দীক্ষামন্ত্রদাতা। নাওয়া খাওয়া দুইটী সহজ কার্য্য, শারীরিক প্রকৃতি সাধিত দেখিতে চায়। ধর্ম্ম-প্রকৃতি তেমনই সুপথে যাইতে বলেন নাই, ভাল পথে যাই-বার কথাও নির্দ্দেশ করেন নাই, পুস্তক পড়িতেও আদেশ করেন নাই। জীব প্রত্যূষে উঠিয়া যদি স্নান আহার করিতে চায়, তবেই সে আপনার প্রকৃতির উপদেশ লাভ করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্ত করিলে আর কিসের প্রয়োজন?

একদিন পৃথিবীর পথে বালক, সঙ্গীদিগের সঙ্গে বাল্য-ক্রীড়ায় কর্দ্দমলিপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, পাঁচ জনে বলিতে লাগিল, বিবর্ণ হইয়াছে তোমার দেহ; বিশ্রী হইয়াছে তোমার শরীর, অত্যন্ত ধূলি ও কর্দ্দমে। বালক হাস্যাস্পদ হইতেছে বুঝিল, কর্দ্দমলিপ্ত দেহে অবস্থান করা ভাল নয়, জানিল। শরীরে কষ্ট বোধ হইতেছে, এত মলা ধরিতে

পাওয়া যায় না; এই বলিয়া, কোথায় নদী কোথায় পুষ্করিণী. এক ঘটী জল, এক বাটী জল কোথায়, একটু জল কোথায় পাইব, এই বলিতে বলিতে সে দৌড়িল। জল যেমন গাত্রে দিল, অমনই পরিষ্কৃত হইয়া পড়িল। কাল তনু ছিল, জলে ধৌত হইয়া কি চমৎকার হইল। অত যে ময়লা ছিল শরীরে, স্নানের পর যেন নব মানুষ হইল।

তুমি কি পিতা! তোমার সন্তানকে স্নান করাইয়া কোন দিন মুখখানি দেখিয়াছিলে? দেখিতে কেমন সুন্দর হয়, তাহা কি দর্শন করিয়াছিলে? তুমি কি বৃদ্ধ! স্নানের পর তোমার কিরূপ রূপান্তর প্রকারান্তর হয়, তাহা দর্পণ ধরিয়া অবলোকন করিয়াছিলে? কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হয়, তাহা কি পরিমাণ করিয়াছিলে? যদি করিয়া থাক, তবে স্বীকার করিবে, স্নানেতে মানুষ নূতন হয়। যখন বৈশাখের রৌদ্রে কাঠ ফাটিতে থাকে, প্রস্তর সকল খণ্ড খণ্ড হয়, সে সময় শরীর স্বভাবতঃ শীতল জল অন্বেষণ করে। দেহ ঠাণ্ডা করিব ভাবিয়া তখন উত্তপ্ত জীব দৌড়াইতে আরম্ভ করে। কি সুখ তখন হয়, যখন সে জলে অবগাহন করে। গঙ্গাজলে গিয়া ডুব দেয়, আর শরীর শীতল বোধ করিয়া আঃ—আঃ বলিতে থাকে। বৈশাখ মাস সাক্ষী; ভয়ানক রৌদ্র সাক্ষী। মানুষ জানে, এ সময় স্নান ব্যতীত সে বাঁচে না। মধ্যে মধ্যে কেবল স্নানই করে, প্রাতে স্নান করে, অপরাহ্নে জলে নিমগ্ন হয়। যেন স্বভাব চায় জল; জল বিনা দগ্ধ দেহ কোন

মতেই বাঁচে না। হে মনুষ্য! হিন্দুস্থান মধ্যে স্নানে মতি তোমাকে গুরু দেন নাই, বেদ বেদান্ত দেন নাই; ন্যায়-বিদ্যাবিশারদ উচিত বুঝিয়া তোমাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন নাই। মনে হইল, স্বভাব চাহিল, আর জলে পড়িলে, ময়লা প্রক্ষালন করিলে, জ্বালা নিবারণ করিলে। যেমন স্নান করিলে, মলা গেল, উত্তাপ গেল। কিন্তু শুদ্ধ এই কথা বিজ্ঞানবিহীন লোকেও বলিতে পারে। সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানী বলেন, স্নানে স্বাস্থ্য সঞ্চার হয়। শরীরের মলা গেলে স্বাস্থ্য হয়; উত্তপ্ত দেহকে শীতল করিলে দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুস্থতার পথে গমন করে। স্নানে অনেক উপকার।

স্নানের পর ক্ষুধা প্রবল হয়, দেহ খাদ্য পাইবার জন্য চীৎকার করিতে থাকে। বাণিজ্য ব্যবসায়ে লোকে ধনী হয়, কর্ম্ম কার্য্যেই সময় যাপন করে, বহু অধ্যয়নে পণ্ডিত হয়, এ সমুদয় কেন? কেবল খাইবার জন্য; জঠরানল নিবৃত্তির জন্য; খাদ্য অভাবে এমনই বোধ হয়, যেন শরীর গেল, মাংস অবসন্ন হইল, মৃত্যু যেন দেহে প্রবেশ করিয়া বধ করিবে। হয় খাদ্য, নয় মৃত্যু। এই ভাবিয়া স্নানের পরই মানুষ আহার করিতে চায়। প্রকৃতি গুরু হইয়া বলিতেছেন, অন্য মন্ত্র নয়, কেবল আহার। আহারের পরই কি দেহের চাকচিক্য, কি আশ্চর্য্য লাবণ্য, কি চমৎকার অনির্ব্বচনীয় কান্তি। সমুদয় দেহ যেন যৌবনের কাল

লাভ করিল। পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে নিতান্ত যে অশক্ত ছিল, দুর্ব্বল ছিল, হতশ্রী ছিল, আহারের পর পুষ্টি, কান্তি যৌবনের তেজ, সিংহের রক্ত তাহার শরীরের মধ্যে আসিল। ঐ দেখ, ব্যাধিযুক্ত শরীর সুস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, এ ব্যক্তি সমস্ত জাতির মধ্যে প্রেম দিবে, ধর্ম্মোৎসাহ প্রদীপ্ত করিবে; কিম্বা কোন বাণিজ্য ব্যবসায় কিছু করিবে। একবার স্নান করিল, পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িল। একবার আহার করিল, সিংহের ন্যায় বলশালী হইয়া উঠিল।

সাধু যুবা, তুমি স্নান কর; আহার কর। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, সেখানকার লোকে কেবল স্নান করেন, আহার করেন। এ পৃথিবীতেও প্রকারান্তরে তাহাই। সংসারে শরীরসম্বন্ধে লোকে যাহা করে, ধর্ম্মরাজ্যে আত্মাসম্বন্ধে তাহাই করিতে হয়। এ উপদেশের গুরু কে? প্রকৃতি। কি কর প্রাতঃকালে? স্নান। তার পর? আহার। যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই এই উত্তর দিবে। বেদ পাঠ কর না? না। স্বস্ত্যয়ন? না। ব্রতাদির অনুষ্ঠান? যাগ যজ্ঞ? না। ভক্তিরসামৃত পান, কি নৃত্য, কি বান্ধবদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা, কি পাঠ, চিন্তা, তপস্যাদি কিছুই কর না? বাস্তবিক সমুদয় পেষণ করিয়া দেখিলে এক বস্তুতেই সমস্ত পরিণত হয়। কেবল বস্তু, স্নান ও ভোজন। এই জন্যই বোধ হয়, এক বিধানের প্রেরিত মহাপুরুষ স্নান ও

ভোজনকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

দেখ, বালক যদি পৃথিবীর পথে ধূলি খেলা করে, সুন্দর রূপ লইয়া সে ফেরে না। মা জানেন ঘরে যখন ফিরিল, তখন সন্তান কৃষ্ণবর্ণ। মা তাহার শরীর ধৌত করিয়া দিলেন, মুখ হাত ধোয়াইলেন, পা দুখানি পরিষ্কার করাইলেন, চুল আঁচড়াইয়া দিলেন, গায়ে একটু তৈল মাখাইলেন। শরীর পরিষ্কৃত ও চাকচিক্যশালী হইল; কান্তি খুলিল। আবার তোমার জননীর জননী রোজ এইরূপ করেন। তুমি যদি স্নান না কর, স্বাভাবিক যদি না হও, মা তুষ্ট হন না; তুমিও তুষ্ট হইতে পার না। স্বর্গ হইতে যে পরিষ্কার জল পৃথিবীতে পতিত হয়, পাঁচ মিনিট পড়িয়া থাকিলে অত্যন্ত কর্দ্দমযুক্ত মলিন হইয়া যায়। স্বর্গের বৃষ্টিকে কর্দ্দমযুক্ত করে এরূপ ভয়ানক স্থান যে পৃথিবী,—সেখানে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কেহ মলিন না হইয়া বেড়াইতে পারে না। শরীরে কাদা লাগিলেই বলিতে হয়, জল চাই, জল দাও। কৃষ্ণবর্ণ থাকা যায় না; প্রক্ষালিত হইয়া নূতন কাপড় পরিব, দেহে ময়লা লাগিলে কোন্ বালকের না এ ইচ্ছা হয়? কোন কোন পরিবারে রবিবারে স্নান নির্দ্দিষ্ট আছে। সে দিন সেই পরিবারের পিতা পুত্রে সকলে মিলিয়া গঙ্গাতীরে গিয়া আনন্দে স্নান করে। কেন হে বালক, এত আনন্দ কেন? সে দিন বালককে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলে, আজ

যে রবিবার, আজ যে স্নান করিবার দিন। বালকের কতই আনন্দ! যেন কোন নৃপতি রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, যেন কোন ব্যক্তি অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। বালক স্নান করিয়া শীতল হইবে, সুন্দর দেহ হইবে, এই ভাবিয়া তাহার অতুল আনন্দ।

যখন জীব স্নান করে, তখন প্রকৃতি সুমধুর ওষ্ঠ প্রকাশ করিয়া হাস্য করেন। যখন আমরা সংসারের ধূলাতে ও ময়লাতে মলিন কাফ্রির মত হইয়া পড়ি, তখন আমাদের জননী জল দ্বারা ধৌত করিয়া দেন। হাতে কালী, মুখে কালী; জল ছাড়া এ ময়লা কোনরূপেই যাইবে না। যুবা বৃদ্ধ মলিন হইয়া যখন চীৎকার করিয়া বলে, শরীর ময়লায় কেমন করিতেছে, ময়লা দূর না হইলে আর থাকা যায় না, অমনই প্রার্থনা জল, আরাধনা জল, সঙ্গীত জল, ধ্যান জল, তপস্যা জল তাহাদিগের উপর পতিত হয়। এক একটী নদী, এক একটী হ্রদ, এক একটী পুষ্করিণী। প্রার্থনা যদি নদী হয়, ধ্যান তবে সমুদ্র। যত জলের আবশ্যক, তত জলে পড়িতে হয়। সঙ্গীত পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া কেমন ঠাণ্ডা হওয়া যায়, অধিক জলে পড়িতে হইলে দূরে গিয়া ধ্যান সমুদ্রে অবগাহন করিতে হয়। পুষ্করিণীতে পড়িয়াও যদি দেখি ময়লা গেল না, নদীতে সমুদ্রেতে পড়িতে হইবে। অত ময়লা কি সামান্য জলে যায়? খাবার জলে কি ও ময়লা প্রক্ষালিত হইতে পারে? তুমি পাঁচ মিনিটের প্রার্থনায় অত রাশীকৃত ময়লা

প্রক্ষালন করিবে? অল্প জলে সংসারের কাদা মিশাইয়া পড়িবে। অধিক জলে পড়; দুই ঘণ্টা জলে পড়িয়া থাক। যাদের অল্প মলা মলিন করিয়াছে, একটু জলে তাহাদের পরিষ্কার হওয়া সম্ভব। কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এত ময়লা তোমাকে মলিন করিয়াছে, একটু জলে কি ও ময়লা যায়? সুন্দর যুবার গায়ে একটু ময়লা লাগিয়াছিল, একটী সঙ্গীত জলে তাহা অপনীত হইল। তোমার আত্মা কখনই সহজে প্রক্ষালিত হইবে না। যাও, ঐ ভাগিরথী তীরে যাও; ডোবায় তোমার হইবে না। জলের ভিতর ওঠ আর মগ্ন হও। চিৎ হইয়া সাঁতার দাও; তীরে এস; জল লইয়া কলস কলস মাথায় ঢাল। উপরে নীচে জলের আঘাত লাগিতে লাগিতে বহু উপাসনার পর ময়লা যাইবে। একটু জলে যখন হইল না, তখন বেশী জল চাই, এ কথা বালকেও বলে।

হে ব্রাহ্ম! যখন বেশী মলা গায়ে লাগিয়াছে, তখন কার্য্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিবে। নদীতে যাইবে; জলে পড়িয়া ক্রমাগত স্তব স্তুতি করিবে। দেখিবে চক্ষু দুটী পরিষ্কার হইল। অধিক মলা দেখিতেছ, যাও, সমস্ত অঙ্গ পরিষ্কার কর। পরিষ্কার হইলে বলিবে, মলার ভার বড় ছিল, পরিষ্কৃত শরীর লঘু হইল, শরীরের কি সৌন্দর্য্য প্রকাশিত। স্নানে শুদ্ধ হইলাম এই কি কেবল মনের কথা? না। সে দিন বিষয়হানি, অপমান, লোকের উৎপীড়ন

সহ্য করিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আরাম পাওয়া গেল। ওহে তপস্যাপ্রিয়, কেন তপস্যা করিতেছ? প্রেমসরোবরে ডুব দিয়া ব্রহ্মপদতলে বুঝি পড়িয়া রহিয়াছ? ওহে জীব, তুমি কি পাপের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছ? বৈশাখের রৌদ্রে কি তাপিত হইয়াছ? নক্ষত্রবেগে নদীতে সমুদ্রেতে গিয়া ঝপাৎ করিয়া পড়; বলিবে, আঃ, প্রাণ যেন বাঁচিল। আমি ঠিক বলিতেছি, না মিথ্যা বলিতেছি? বল দেখি, এক এক দিনের গানে হৃদয় একেবারে জুড়াইয়াছে কি না? এই জন্য হৃদয় জুড়াইবে বলিয়াই স্নান করিতে অভিলাষ করি। ঐ যে আমাদের গানের স্বরটী, মন্দিরের মধ্যে ঐ একটী সরোবর। এই যে মন্দির, ইহা একটী প্রকাণ্ড সরোবর, সুবিস্তৃত নদী। এই মন্দিরের বাহিরের দিকে বৈশাখ মাস, কিন্তু ভিতরে চিরকালই ভাদ্র মাস। যেমন জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া এখানে আসিলে, অস্থির ভাবে আসিয়া এখানে জলে পড়িবামাত্র শীতল হইলে। মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী, দুইবার বলিতে না বলিতে প্রাণ জুড়াইল। কাহারও কথায় ডুব দিবে না; আমার কথায় ডুব দিবে না। কিন্তু যখনই প্রকৃতি বলিবে, যখনই অন্তরের হাড় ফাটিবে, তখনই তোমার হৃদয় হৃদয়কে বলিবে, স্নান কর, নতুবা মরিবে। এই যে মন্দিরের মধ্যে এত ব্যাপার হইতেছে, এই যে আরাধনা ও প্রার্থনা, পাঠ ও তপস্যা, যত কিছু হইতেছে, ইহার উদ্দেশ্য প্রত্যেকের নিকট এক একটী

সরোবর আনিয়া দেওয়া। এই করিলেই তোমার আমার কার্য্য হইল। পাপ কলঙ্ক মোচন করিয়া, জ্বালা দূর করিয়া শান্তি পাইব, এই স্থির করিয়াছি।

আর কি চাই? ভোজন। বাহির হইতে জল লইয়া বাহিরে ঢালিলে শরীর পরিষ্কার হয়; পুষ্টির জন্য আবার আহার চাই। মলা ত গেল, পরিষ্কার ত হইল, এখন অন্তরে কিছু প্রবিষ্ট করিতে হইবে। যদি সুখ বোধ করিতে চাও, আহার করিতেই হইবে। কোথায় শক্তি পাইবে, যদি আহার না কর। বল রক্ষার জন্য নানা প্রকার আহার্য্য বস্তু চাই। যখনই ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হও, তখনই খাদ্য অন্বেষণ কর। এক জনের কাছে বিবেক, আর এক জনের কাছে ভক্তি। ক্ষুধায় কাতর হইয়া ঈশা ভক্ষণ, মূসা ভক্ষণ, চৈতন্যকে পান, বুদ্ধকে আহার কর, ক্ষুধা শান্তি ও পুষ্টিলাভ হইবে। সে দিন গিয়াছে, যে দিন লোকে ইহাঁদিগকে ঈশ্বর বোধে আদর করিত। নববিধানের প্রারম্ভ অবধি এই জ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে যে, এই সমুদয় সাধু কেবল সাধু নহেন, সাধুতা; কেবল জ্ঞানী নহেন, জ্ঞান; কেবল প্রেমিক নহেন, ইহাঁরাই প্রেম; সুবোধ নহেন, সুবুদ্ধি। মনুষ্য হইলেন অবস্থা, সাধু হইলেন খাদ্য দ্রব্য। উপহাসের কথা নয়; আহার করিবে বলিয়া মহেশ্বর দিলেন। এই লও, ঈশা-চরিত্র ও গৌরাঙ্গচরিত্রকে আহার কর। কেবল স্নান করিলেও হয় না; পাপ গেল, কিন্তু পুণ্য হওয়া চাই। পাপমলা

প্রক্ষালিত হইলেই কি সমস্ত শেষ হইল? অভাব পক্ষের সাধন হইলেই কি যথেষ্ট হইল? ভাব পক্ষেরও প্রয়োজন।

পেটুক ক্ষুধার সময় যেমন হাঁউ হাঁউ করিয়া ভোজন করে, সাধুরূপ শস্য যে হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই থান হইতে অন্নের ধান আনিয়া ক্ষুধা শান্তি করিব। খাদ্য এমনই, যত খাই ততই খাইতে ইচ্ছা হয়। ভক্তিদুগ্ধের সঙ্গে ভক্তঅন্নকে একত্র করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট করিব, উদরে ঢালিব; যতই এইরূপ করিব, ততই সবল হইব। আহার করিলে পর দেখিব, ছিলাম রুগ্ন মৃতপ্রায়, আজ অন্নাহারে সবল হইয়াছি। তখন কেবল এই বলিব, দেখ ঈশার বিবেক, মুসার ব্রহ্মবাণী শ্রবণ, বুদ্ধের নির্ব্বাণরূপ সত্য এমনই আহার করিয়াছি যে, খাইয়া মহাসুখী হইয়াছি। মা আমাকে যথেষ্ট আহার দিয়াছেন। বলিয়াছেন, যত দিন বাঁচিবি, যত ইচ্ছা, এই সব খা। তোমার আমার মা আর কি চান? খুব খাও তুমি, তোমার মা প্রফুল্ল হইবেন। এবারকার ভাদ্রোৎসবে এই উপদেশ, কেবল স্নান কর, কেবল আহার কর। আর ঈশাকে উপহাস করিও না। হে চৈতন্য, তব পদে নমস্কার, এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিও না। এবার ধান্যরূপে সাধুরা আসিয়াছেন; ফলরূপে সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রেরিত মহাপুরুষগণ চাল, ডাল, লবণরূপে এবার সমাগত হইয়াছেন। আর পুস্তক পড়িতে হইবে না। ঈশাবান্, চৈতন্যবান্, নির্ব্বাণবান্ যে ব্রহ্মভক্ত,

যিনি সাধুদিগকে আহার করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া আমি সকলকে ভোজন করি। আবার আমাকে শুদ্ধ লইয়া সকলকে তুমি খাও। এইরূপে শতাব্দী গ্রাস করুক শতাব্দীকে। শেষ শতাব্দী গ্রাস করুক প্রথম শতাব্দীকে; দ্বিতীয়কে গ্রাস করুক তৃতীয় শতাব্দী। এইরূপে চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দী সকলকে আপনাদের ভিতরে হজম করিয়া ফেলুক।

হে জীব, কেবল খাও আর দেখ, তাঁহাদের শোণিত তোমার শোণিত হইয়াছে কি না। ইহা যদি হইয়া থাকে, নববিধান সফল হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্থক হইয়াছে। আর কিছু মা চান না। ময়লা হলে স্নান করাইবেন, ক্ষুধিত হইলে আহার করাইবেন। আমার মা আজ আমাকে নাওয়াইলেন, খাওয়াইলেন; পরিস্কৃত ও পরিপুষ্ট হইলাম, এই জন্য এ কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি। অগ্রাহ্য করিবে না; শিরোধার্য্য করিবে। কি কথা? একবার জলসংস্কার করিতে হয়, একবার সাধুভক্ষণ করিতে হয়, পূর্ব্বকার বিধানের সময় বলা হইয়াছিল; নববিধান বলিতেছেন, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর, প্রত্যহ জলসংস্কারে সংস্কৃত হইবে; প্রত্যহ ব্রহ্মপূর্ণ জলে অবগাহন করিতেছি এই ভাবিতে ভাবিতে স্নানক্রিয়া সমাধা করিবে। প্রত্যহ আহারের অন্ন পুণ্যরূপে, জল প্রেমরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মাকে স্বর্গীয় পুষ্টি দান করিবে। এই মন্ত্রের সাধন কর। প্রত্যহ স্নান ব্রহ্মজলেতে; প্রত্যহ আহার ব্রহ্ম আহারে। ইহাতেই

জগৎ বাঁচিবে। এই সহজ পথ ধরিয়া, ভাই বন্ধু, স্বর্গারোহণ কর।

হে দীন দয়াল, হে আমাদের অন্নদাতা, জলদাতা, শান্তি-দাতা, মোক্ষদাতা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে উৎসব দিবসে মিনতি করিতেছি, আমাদের শরীরকে যেমন জল দ্বারা শুদ্ধ কর, মা হইয়া হাত ধরিয়া তেমনই তোমার প্রেমগঙ্গাতে আমাদিগকে স্নান করাইয়া ভাল কর। দেখ, আমরা, সংসারকর্দমে লিপ্ত হইয়াছি; তোমার কাছে মুখ দেখাইতে পারি না; ভাই বন্ধুরাও কেহ কাছে যাইতে দেয় না। গায়ে ময়লা কেবল নয়, দেখ মনে কত ময়লা। রাশি রাশি পাপ সঙ্গে করিয়া উৎসবে আসিয়াছি। কোথায় তোমার জল? যেখানে জলসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সেই প্রেরিত পুরুষ পবিত্রাত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেইখানে একবার মগ্ন হইব। মন্দির-মধ্যে একবার সেই জল আনিয়া দাও; অবগাহন করিয়া পবিত্রাত্মাকে দর্শন করি। প্রার্থনা আমি কেন করি? আরাধনা করিলে কি হইবে? একবার দুইটী হাত ধরিয়া ছেলেকে যেমন মা জননী স্নান করান, তেমনই একটু তৈল মাখাইয়া, গায়ে একটু হরিদ্রা মাখাইয়া, আমাদিগকে স্নান করাও। কাল অঙ্গ আর রাখিব না; এবার ভাগবতী তনু করিয়া দাও। জ্বালায় প্রাণ অস্থির; ঠাণ্ডা কর। গরম দেহের উপর শীতল জল একবার ঢাল। একবার ব্রহ্মজলের ভিতর ডোবাও। ভয়ানক উত্তাপ; পাপের তেজ শরীরকে

কাতর করিয়াছে। আর অন্য মন্ত্র লইব না; এবার জল-সংস্কারে সংস্কৃত হইব। এ জল আত্মার পানীয়; জড় জল নয়। এ আমার ব্রহ্মপদনিঃসৃত জল। এই হরির জল যেমন শরীরের উপর পড়িবে, অমনি আত্মার উপরেও পতিত হইবে। এই জলে অবগাহন করিলাম; আমার শরীরের ময়লা গেল; জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইল। এবার ভাই বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাইলেই বলিবেন, ঠিক হইয়াছে; প্রাণের ভিতর হইতে গভীর কলঙ্করাশি চলিয়া গেল। হে প্রাণেশ্বর, তুমি অনুগ্রহ কর, প্রত্যহ স্নানকে ধর্ম্ম ক্রিয়ার মধ্যে করিয়া স্নানের ঘরকে যেন উপাসনার ঘর করিতে পারি। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যখন স্নান করিব, কিম্বা নদীতীরে গিয়া যখন স্নান করিব, জ্বালা জুড়াইবার জন্য, ময়লা দূর করিবার জন্য জলে অবগাহন করিব; বলিতে যেন পারি, এই জলের প্রতি বিন্দু ব্রহ্মবিন্দু হউক। এই জল যেমন আত্মার গায়ে লাগিবে, অমনি নূতন জীব হইয়া যাইব। জলে ডুব দিব আর বলিব, ডুবিলাম ব্রহ্মসাগর মধ্যে। বুঝিব যে তাহাতেই দেহ মন শুদ্ধ হইল। দেখিব অহঙ্কারী স্নান করিয়া বিনয়ী হইল, কামাচারী জিতেন্দ্রিয় হইল, লোভী সন্ন্যাসী বৈরাগী হইয়া স্নান করিয়া উঠিল। হে মাতঃ, বিশ্বজননি, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এই স্নান প্রবর্ত্তিত কর। এঁরা যেন প্রতি দিন ব্রহ্ম-জলে স্নান করিয়া এই দেখান, স্নানের আগে যে অসুরের মতন ছিল, স্নানের পর সে এমনই হইল, ইচ্ছা হয় যেন

স্কন্ধে করিয়া নাচিতে থাকি। স্নানের পর কাহারও যেন অসুখের মুখ দেখিতে না হয়। প্রত্যেকের স্নানের ঘর মন্দির করিয়া দাও; তীর্থ করিয়া দাও; জল লইয়া যেন আর বৃথা ঘাঁটাঘাঁটি না হয়; জলের স্নানকে ব্রহ্মেতে স্নান করিয়া দাও। ময়লা তাড়াইতে হইলেই ব্রহ্মজলে খানিক বসিয়া থাকিব। বলিব, রাগ, তুই যাবি না? আজ রাগ একেবারে না গেলে স্নানের ঘর পরিত্যাগ করিব না। লোভ ছাড়িল না? স্নানের ঘর কোন মতেই ছাড়া হইবে না, কেবলই জল ঢালিতে থাকিব। অল্প জলে হইল না, আরও জল ঢালিব। বৈরাগী, সন্ন্যাসী, ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী হইয়া তবে ঘর পরিত্যাগ করিব। হে দেবি, দয়া কর, অল্পে না হয় নদীর ভিতর লইয়া যাও; ধোও মা ধোও। মা জগদীশ্বরি, বল প্রকাশ কর। তোমার অসুর সন্তানের এত পাপ বুঝি যাইবে না? পঁচিশ বৎসরের পাপ হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঢাল জল, এই যে একটু একটু দাগ উঠিতেছে; এবার কাম ক্রোধ লোভ সব যাইবে। আর অসুরের মত থাকিব না; স্নানের পর শরীর মন ধক্ ধক্ করিবে। লোকে বলিবে, এ যেন সে নয়; সে দিব্য বর্ণ কেমন করিয়া ধরিল? আহা! তখন আপনার রূপ দেখিয়া আপনি মোহিত হইব। স্নান যখন হইল, উপাসনা ত ঐখানেই হইল। তার পরই দেখি, কত খাদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছ। মা, এত খাব? সোণার থালায় এত খাবার সাজাইয়াছ? কলাপাতা

শালপাতা বই আহারের পাত্র আছে যে জানিত না, তার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ বুঝি? আজ বুঝি তাহাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া আদর করিয়া খাবার নূতন জায়গা দিয়াছ? এক শত বার মন্দিরে গিয়া যাহা না হইয়াছে, হিমালয়ে গিয়া ধ্যান করিয়া, বেদ পুরাণ পাঠ করিয়া যা না হইয়াছে, আজ স্নান করিয়া তাহা হইল। আজ যে মা স্নানের পর চেলির কাপড় পরা ছেলে দেখিয়া তোমার মুখে হাসি ধরিতেছে না। মাথায় জল ঢালিয়া পরিত্রাণ করিলে? আমি যে বড় লোভী ছিলাম, সংসারের ক্রীতদাস ছিলাম, সংসার আমার গায়ে যে আলকাতরা দিয়াছিল। আজ যে আমি নেয়ে পরিত্রাণ পাইলাম। নেয়ে যদি এত সুখ, না জানি ভোজনে কত সুখ! মা, কত খাব? সোণার পাত্রে কত খাব? আহা, ঈশা, মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া সুখে খাইব বলিয়া আজ অন্ন হইয়াছ? গুপ্ত চোর, ছদ্মবেশ ধরিয়াছ? বঙ্গ-দেশোৎপন্ন অন্নরাশি, অন্ন ত তুমি নও; তোমার ভিতর আমার প্রাণের দাদা ঈশা আছেন। তোমাকে খাইয়া ঈশাবান্ হব। অন্ন! অন্ন! আমার মুখে তুমি যাইবে? ভাই গৌরাঙ্গ, তুমি যখন নবদ্বীপ ছাড়িয়া স্বর্গারোহণ করিলে, যখন তোমার নবদ্বীপলীলা, ভারতলীলা শেষ হইল, তার পর কেউ তোমার সন্ধান পাইল না। তার পর তুমি কি মিছরির সরবৎ হইলে? জলবিন্দু হইলে? নববিধানের বিধাতার আজ্ঞায় পুরুষাকৃতি ছাড়িয়া সলিল হইলে? তোমার তুমিত্ব

ভাবরূপে পরিণত হইল? মা আনন্দময়ি, খাওয়া দেখিয়া তুমি হাসিতেছ? সাধু সন্তানকে ভোজনের সামগ্রী করিয়াছ? আর ত মন্দিরে যাইবার দরকার নাই। ঐ স্নানের ঘর, এই ভোজনের ঘর। ঐ ঘরে পরিষ্কার হয়ে এই ঘরে কত খাবার খাইব। আজ কি খাবারই খাইতেছি! গরিবের ছেলে কেবল ভুট্টা, মোটা চালের ভাতই খাইয়াছি, তাও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই। ওহে দেবগণ, সাক্ষী হও; উৎসবক্ষেত্রে দেখিয়া যাও, খেয়ে মানুষ স্বর্গে যাইতেছে। খেতে খেতে চক্ষু হইতে দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতেছে। সাধুরা কেউ মিষ্টান্ন হয়ে কেউ দুগ্ধ হয়ে উপস্থিত। আহারের পর ভিতরে ঢুকিয়া যে যার নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। বুকের ভিতর এই যে ঈশা নাচে, গৌরাঙ্গ নাচে, ধ্রুব প্রহ্লাদ নাচে। ঐ যে তাঁরা বলিতেছেন, ওরে তোর ভিতরে আসিবার জন্য ভাত হইয়াছিলাম। তোর আত্মার মধ্যে মানুষ কিরূপে আসিবে? তাই খাবার বাটীতে গেলাম, তাই তোর জলের কুঁজোতে প্রবেশ করিলাম, আবার এখন নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছি। মা আনন্দময়ি, নেয়ে খেয়ে পরিত্রাণ হয়, এই সংবাদ তুমি ঘোষণা কর। দুঃখী পাপী সব পরিত্রাণ পাইবে। খুব কসে নাওয়াও, আর খুব কসে খাওয়াও। কি কচ্চ? কি বলছ? আজ দেখিতেছি কেবল যে নাওয়া খাওয়ার কাজ। মা নদীতে ডুবাইয়া নূতন কাপড় দিও, অমৃত সরোবরে স্নান করাইয়া পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত দিও।

তোমার হাতের রান্না ভাত খাব, অসাত্ত্বিক রান্না আর খাব না। মা আনন্দময়ি, তুমি কেমন রাঁধ! ঐ ঈশা, ঐ চৈতন্যকে তুমি কেমন রাঁধিয়াছ! বৈষ্ণবেরা পারেন নাই খ্রীষ্টবাদীরা পারেন নাই। তুমি আজ সব সাধুদের গাছের ফল করিলে মিষ্টান্ন করিলে? খুব খাই, খুব খাই, উদর পূর্ণ করি। স্নান করিয়া শীতল হব, আহার পান করিয়া পুষ্ট হব, এই বলিয়া আজ উৎসবে নাচিব, গাইব। তোমার অমৃত পুত্রদের অনন্ত চরিত্র আহার করাও। মা, ভিক্ষা চাই, করুণাসিন্ধু, যেন ভাল করিয়া স্নান করি প্রতি দিন, আহার করি প্রতি দিন। ভক্তবৎসল হরি, দয়া করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

মুক্ত অবস্থা।

রবিবার ৫ই চৈত্র, ১৮০৪ শক : ১৮ই মার্চ্চ ১৮৮৩।

আমরা সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে ধর্ম্ম সাধন করিতেছি; কিন্তু কি হইব, পরিত্রাণের অবস্থা কাহাকে বলে, তাহা কি আমাদিগের আলোচনা করা কর্ত্তব্য নয়? কতকগুলি পাপ ছাড়িলেই কি কৃতার্থ হইলাম? সংযতেন্দ্রিয় হইলেই কি স্বর্গ লাভ হইবে? সংসারীদিগের ন্যায় হইলাম না, দয়া ধর্ম্ম কিছু পরিমাণে উপার্জ্জিত হইল, ইহাতেই কি আমাদের আশা পূর্ণ হইবে? শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা কর, কি

বলেন। হিন্দুশাস্ত্র, খ্রীষ্টশাস্ত্রের স্কন্ধে হস্ত দিয়া এক প্রাণ এক বাক্য হইয়া বলিতেছেন, দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ আবশ্যক, নতুবা স্বর্গপ্রবেশ করা যাইবে না। বাস্তবিক মুক্ত হওয়া, স্বর্গ লাভ করার অর্থ আর কিছুই নয়, দ্বিজ হওয়া, দ্বিতীয় বার জন্ম লওয়া।

পিতা মাতার নিকট জন্মগ্রহণ করিয়া যেমন পৃথিবীতে আসিয়াছি, তেমনই স্বর্গস্থ পিতার নিকটে জন্ম লইয়া স্বর্গে আসিব। দুই চক্ষু দুই কর্ণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সংসার-ক্রিয়া সাধন করিতেছি; এইরূপে বিশ্বাস ভক্তি, পুণ্য আনন্দ লইয়া, জ্ঞানচক্ষু বিবেককর্ণ লইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া, ভূমি পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গে আরোহণ করিয়া, স্বর্গক্রিয়া সমাধা করিব। ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, মুক্ত ও বদ্ধ, স্বর্গবাসী ও রসাতলবাসীর এই প্রভেদ। তুমিও সাধু নও, আমিও সাধু নই। যদি বড় লোক হই, তবে সে ব্রহ্মকৃপা বলে। ব্রহ্মমন্দিরে আসি বলিয়াই যে আমরা স্বর্গের লোকদের মধ্যে পরিগণিত হইব, তাহা নহে। দক্ষিণে ঐ যে ভাই বিনয়ী, বামে উনি সংকল্পশীল দয়ালু, তুমি জিতেন্দ্রিয়, আমিও সৎপ্রকৃতি। চারিজনেই পৃথিবীর ভাল লোক। সংসারে ভাল মন্দ আছে, ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম আছে, আমরা না হয় পৃথিবীর ব্রাহ্ম হইলাম; কিন্তু সে রাজ্য বহু দূরে, যেখানে আমাদের উপনীত হইতে হইবে।

জীবনঘোড়া চলিতেছে সংসারের ভিতর। সংসার পরি-

ত্যাগ করিয়া স্বর্গের প্রথম সোপান জীবন অশ্ব স্পর্শ করিয়াছে। পৃথিবীতে দশ হস্ত উপরে বসিয়াছি, দুই তালা তিন তালা ঘর আছে; উচ্চ ছাদে বসিয়া এ কথা বলা যায়। ইহাকে ধর্ম্মরাজ্যে উচ্চপদারূঢ় বলা যায় না। ইহারা ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে, মলিন পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া আছে; কিন্তু গগনবিহারী ভূমি স্পর্শ করে না, পৃথিবীর অবলম্বনকে অবলম্বন বলে না। পল যেমন স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, অথবা হিন্দু শাস্ত্রে যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে আমরা বহু দূরে। রাগ গেল, গেলই; রসনা মিথ্যা বলে না, বলে না। ঐ দেখ, কত অক্রোধী কত সত্যবাদী। তুমি দান কর, তুমি যশস্বী হইয়াছ? ঐ দেখ, কত লোক যশস্বী। হে ব্রাহ্ম, এই বলিয়া তোমাকে সুখ্যাতিপত্র দিতে পারি, তুমি পৃথিবীর ব্রাহ্ম; তুমি দুই হাত দুই পা বিশিষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ অবস্থায় থাকিলে চলিবে না; সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যেখানে প্রবেশ মাত্র আপনাকে পূর্ব্বের লোক বলিয়া চিনিতে পারিবে না।

আত্মবিস্মরণ সেখানকার একটী লক্ষণ। আত্মবিস্মরণ যদি না হইয়া থাকে, অমনই বুঝিতে হইবে, যে এ ব্যক্তি স্বর্গবাসী নয়। পৃথিবীর লোক তোমাকে রাজা করিতে পারে, উচ্চপদস্থ করিতে পারে, কত প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু মুক্ত না হইলে সে স্থান তোমার নহে। সেখানকার প্রথম প্রশ্নেরও উত্তর তুমি দিতে পার না। এখনও আপনাকে

চিনিতে পার? যে ব্যক্তি কার্য্য করিতেছিল, সেই তুমি? যার বাপ মা মানুষ, সেই তুমি? সংসারীদের দোকানের লোক তুমি? নাম উপাধি তোমার সেই? হাঁ। জাতি-ভেদসূচক পদবী সেই? হাঁ। তুমি সেই লোক স্বীকার করিতেছ? জাতিভেদ নাই? যাহাদের এইটুকু মাত্র উন্নতি হইয়াছে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি বলিতে হইবে, কিন্তু যথার্থ দ্বিজ তাহারা নহে।

পুরাতন মানুষের প্রাণত্যাগ ও নূতন মানুষের জন্ম না হইলে স্বর্গরাজ্য হইবে না। গুণের তারতম্যে স্বর্গবাসী, পৃথিবীবাসী হয় না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাব দেখিয়া বোঝা যায়, আত্মবিস্মরণ হইল কি না। সে রাজ্যে প্রবেশ করিলেই মনে হয়, কৈ আমি ত দোকানে কাজ করি নাই; আমি ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি নাই; নৈহাটী ভাটপাড়ায় আমি বাস করি নাই। আমার পিতা মাতা পৃথিবীর লোক মনে হয় না। আমার সঙ্গী অমুক অমুক ছিল শুনিতে পাই, কিন্তু চিনিতে পারি না। ছেলেবেলা রাগ ছিল, কি, কি ছিল, শুনিলে উপন্যাস মনে হয়; আমার কিছুই ছিল না। আমি কে? একজন মানুষ যে এই মাত্র জন্মিয়াছে; সদ্যোজাত শিশু আমি। ঈশ্বরের কাছে জন্মিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া মানি। স্বর্গের ভূমিতে জন্মিয়াছি; স্বর্গীয় ভাই ভগিনী; স্বর্গীয় ভূত ভবিষ্যৎ; স্বর্গীয় তনু, স্বর্গীয় হৃদয়; এই আমি জানি।

দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণের অর্থ এই যে প্রথম জন্ম অস্বী-

কার। ইহা যদি না হয়, দ্বিতীয় বার জন্ম কেন বলা হইল? কেন উন্নতি শব্দ প্রয়োগ করা হইল না? ছোট অশ্বত্থ গাছ বড় হয়, ছোট মানুষ বড় হইবে, এই কেন বলা হইল না? মহাজনেরা বলিয়াছেন, জীবিত মানুষ মরিবে, বিভিন্ন মানুষ আসিবে। সুতরাং চিহ্নও থাকিবে না। গাছ দগ্ধ হইলে তাহা হইতে কি বৃদ্ধিশীল শোভাযুক্ত পল্লবিত কুসুমিত তরুর উৎপত্তি হয়? না। একটী ছেলে মরিয়া গেল, তার মধ্য হইতে কি কেহ একটী রাজার মত সুন্দর ছেলে বাহির করিতে পারে? না। যখন মরিল, নাট্যশালার অভিনয় শেষ হইয়া গেল। যদি দেখি আর একজন মানুষ নূতন তনু, নূতন ভাব লইয়া আসিল, তবে বলিব, ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মরাজ্য-বাসী ইনি।

যদি কেহ দেখান, তিনি এখন সংসারের টাকা কড়ি ভালবাসেন না; কিন্তু ছোট ছোট টাকা কড়ি ধর্ম্মের ভিতরে হয় ত ভালবাসেন। আগে সংসারের কথা বলিলে রাগিতেন, এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাগেন; ইহাতেই বোঝা যায়, পুরাতন মানুষের চিহ্ন রহিয়াছে। আমি বড় লোক বলিয়া যশস্বী হইবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু হয় ত ধার্ম্মিক বৈরাগী বলিয়া যশ পাইবার ইচ্ছা আছে। তুমি হয় ত মনে কর পৃথিবীর লোকে আমাকে কে কি বলে, আমি সে বিষয় গ্রাহ্য করি না; সংসারের লোকে আমায় প্রশংসা করে না, বাহবা দেয় না, তবে কি আমি সাধু নই? তুমি দুই লক্ষ লোকের সহানু-

ভূতি ছাড়িয়া পাঁচ জন সাধুর বাহবা চাহিতেছ? সাধুদের সাহানুভূতি পাইলে তবে তুমি ধর্ম্ম, উপাসনা করিবে। লক্ষ লোকের সহানুভূতি হইতে দুই জন সাধুর সহানুভূতি প্রবল। তুমি যে কেবল ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিতেছ, তাহা নহে; লাভের চেষ্টা করিতেছ। তোমার জীবনে আগেকার গন্ধ টের পাওয়া যাইতেছে। জীবন ফিরিয়াছে মাত্র। জীবনের কামনা, বাসনা, আশা ছিল সংসারে, আনিয়াছ ধর্ম্মে, এই কেবল প্রভেদ। আগে কেবল সহোদর সহোদরাকে ভাল-বাসিতে; এখন ব্রাহ্মকে ভালবাস, আর একটু মায়া অধিক, একটু অনুরাগ অধিক আপনার সহোদর সহোদরার প্রতি আছে। ইহাঁরাও ভাল, তাঁহারা আর একটু সুন্দর। এ বাড়ী ভাল, পৈতৃক বাড়ী আর একটু সুন্দর। বিপদ আপদ পড়িলে আগেকার আত্মীয়দের দিকে মন যায়। আপনার মার পেটের ভাই, সে এ সময়ে একটু সহানুভূতি দিবে মনে হয়। তবে ত সে মানুষ আছে, যে পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কে সে? সে দিন যাহাকে পোড়াইয়া আসি-লাম, সে মানুষ আবার কিরূপে আসিবে? যে পুস্তক দগ্ধ করা হইল, সেই পুস্তক আবার ছাপা হইবার প্রস্তাব?

আগেকার সম্পর্ক যদি হৃদয় মনকে টানে, বুঝিব তুমি জীবন উন্নত করিয়াছ, কিন্তু নূতন জীবন নহে। যে ঈশার ন্যায় শব্দ করিয়া বলিতে পারে, "কে আমার ভাই? কে আমার মাতা? যে স্বর্গস্থ পিতার কার্য্য করে সেই পিতা

মাতা ভাই।" তুমি কি সেই ব্যক্তি? ব্রহ্মের উদর হইতে জন্মিয়াছে বলিয়াই তুমি ভাই ভগ্নী বল? তুমি সংসারের সম্পর্ক মান না? কুবুদ্ধি পরায়ণ লোকের ঠিকুজি কোষ্ঠি যে দগ্ধ হইয়াছে; সে মানুষ যে আর নাই। ব্রাহ্ম হইলেই সে ভাই। যার টান আছে পুরাতন বাড়ী, পুরাতন দোকান পুরাতন গ্রামের দিকে, সেই পুরাতন লোককে নূতন হইতে অনেক দিন লাগিবে। নূতন জীব হইলেই দেখিব, পুরাতন আকর্ষণ নাই, পুরাতন টান মায়া নাই; স্ত্রী পুত্র পরিবারের পুরাতন মানুষের সঙ্গে সেগুলির সহমরণ হইয়াছে। সেই আগেকার সম্পর্ক লুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পর্কেই ভাই ভগ্নী; এই সম্পর্কেই গ্রাম, বাড়ী, পাড়া, দেশ, রাজ্য। ধর্ম্মের সম্পর্কে সকল সংযুক্ত। রক্তের টান নাই, কেবল স্বর্গরাজ্যের টান।

পুরাতন জীব বুদ্ধিতে চলিত, নূতন জীব এখন কেমন বিশ্বাসে চলে! যে মানুষ দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিত, দশ জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া তবে কোন কথা বলিত, সে মরিয়াছে। এখন এই নবকুমার কি করেন? নবকুমার বলেন, খাইতে পাই না পাই, ভাবিব না। বলিব, যদি কেহ আপনার খাইবার ব্যবস্থা আপনি করেন, সংসারের উপর কতক নির্ভর করেন, তাঁহার ভিতরে দুর্গন্ধ জীব উঁকি মারিতেছে। যদি কেহ বলেন, এ পথ ঠিক কি না, যদি সন্তানদের মৃত্যু হয়, পাঁচ পয়সার অধিক পাওয়া যায় না,

ইহাতে যে স্ত্রী পুত্রের প্রাণ রক্ষা হয় না; সে ব্যক্তি পুরাতন গ্রামের লোকই রহিয়াছে। নব গ্রামের লোক সে নয়।

নূতন জীব প্রমাণ করিতে হইলে বিশ্বাসের লোক হইয়াছেন, দেখাইতে হইবে। প্রাচীন জীবনে যাহা কিছু বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিতেন, বিদ্যা ব্যয় করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা আর এখন করেন না। সংসার হইতে দুইটী টাকা লই, এ কথা তিনি বলেন না। যে বলিত, সে ত নাই। সংসারের টাকা স্পর্শমাত্র তাঁর সন্তান স্ত্রীর হাত খসিয়া যায়। সংসারের টাকা হাতে পড়িবা মাত্র যদি বলেন, "হাত গেল, জ্বলিয়া মরিতেছি" তবেই জানিতে হইবে পূর্ণ বিশ্বাস আগে হইয়াছে। যতক্ষণ ভয় রহিয়াছে, ততক্ষণ ভাবিবে, সাত টাকা নিজে আনিব, পঞ্চাশ টাকা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে লইব; ততক্ষণ তুমি পৃথিবীর ব্রাহ্ম। যাই বিশ্বাস হইল, আর পৃথিবীর টাকা লওয়া হইবে না।

বুদ্ধিতে পুরাতন জীবন, বিশ্বাসে নূতন জীবন। বুদ্ধি ভাল মন্দ হইতে পারে। কেহ ভাল কেহ মন্দ; কেহ ব্রাহ্ম, কেহ অব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম হইলেই যে এই শ্রেণীভুক্ত, তাহা নহে। যিনি বিশ্বাসে হিমালয় টলাইতে পারেন, তাঁহার নিজের চিন্তার শেষ হইয়াছে; তিনি অন্ধকারে শূন্যে ঘর প্রস্তুত করিয়াছেন। যেখানে মানুষের চিন্তা যায় না, সেখানে তিনি বাস করেন। হে বন্ধুগণ, একজন ঈশ্বরের মত নিষ্পাপ, আর একজন পাপী, এ প্রকার বর্ণনা আমি করি

নাই। এক দিনে পাপশূন্য হইয়া যায়, এ কথা বলি না।' ও প্রকার অবস্থায় যাই নাই ; কেহ এ কথা বলিতে পারিবে না। নিষ্পাপ হইবার কথা বলা হইতেছে না। বুদ্ধিজীবী ছিলে, বিশ্বাসজীবী হও ; এই বলা হইতেছে।

আপনি আপনার পরিত্রাণের চেষ্টা করিতেছিলে, ঈশ্বরের কথা অবলম্বন কর। তোমারও বেদ বাইবেল আছে ত? তাহার একটী শব্দও ভ্রান্ত নয়। সেই অনন্ত বেদকে ধরিয়া আগুনে মাথা দিতে হইলে দিবে ; মৃত্যুমুখে দাঁড়াইতে হইলে দাঁড়াইবে। এ ভাবে নূতন জীবন হইয়াছে কি না দেখ। একটু পাপ থাকিলেই যে সংসারীদের দলভুক্ত হইবে, তাহা নয়। তাহা পাপমূলক নয়, দুর্ব্বলতামূলক। বিশ্বাসীর জীবন, ধার্ম্মিক পুরাতন জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রশংসা ইহাতে হইতে পারে, না হইতে পারে, কিন্তু নবজীবন লাভ হইবে।

আমরা নূতন রাজ্যের ভাই ভগ্নী পাইয়া, বন্ধু সঙ্গী পাইয়া কৃতার্থ হইতেছি ; নূতন জীবনের সৌরভে আমোদিত হইয়াছি। আর পুরাতন জীবন নয়, সে পুরাতন রকমের আরাধনা আর নয়। আগে দোকান করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিতে, এখন আর তাহা নয়। নূতন সম্পর্কে পুরাতন সম্পর্কের বিলোপ। নিজ বুদ্ধির লোপ ও বিশ্বাসভূমির অবলম্বন। এই প্রকার নূতন লোক ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক-মণ্ডলীতে দেখিতে চাই। চণ্ডালত্ব পরিত্যাগ করিয়া কলিতে

সুব্রাহ্মণ হও। দ্বিজ যে নয়, সে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে? সে কিরূপে স্বর্গে যাইবে? অতএব ব্রাহ্মগণ, সংসার ছাড়িয়া সংসারী ব্রাহ্ম হইলে; দ্বিজ হইয়া এখন স্বর্গে ভ্রমণ কর।

হে দীনবন্ধু, হে দ্বিজদিগের হৃদয়ভূষণ, এই লোকেরা ক্রমাগত সংসারের বোঝা বহন করিয়া কর্ম্ম সাধন করিতেছে, সংসারের পথে বহু চেষ্টায় পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিতেছে, স্বর্গের নূতন জীবনের কথা শুনিয়া ইহারা অবসন্ন হইবে। চলে এসে শুনিলাম, এ স্বর্গের পথ নয়। রৌদ্রের কষ্ট, বৃষ্টির কষ্ট পাইয়া আসিলাম, এখন দুই চারিটী ভাই বন্ধু বলিতেছে, এ পথে চলিও না; এ পথে স্বর্গরাজ্য পাইবে না। কোন্ দিকে সে রাস্তা? যে দিকে ঈশা গৌরাঙ্গ চলিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিল তোমার ঈশাকে, তোমার পিতা মাতা আসিয়াছেন এখানে, একবার দেখিলে না? শুনিবামাত্র ভাবিলেন যেন ধর্ম্মের ক, খ, কাটা হইল; হৃদয় উত্তেজিত হইল; তিনি বলিলেন, কেরে মা বাপ, ভাই বন্ধু কে? আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পূর্ণ করে, সেই আমার সর্ব্বস্ব।

প্রিয় ঈশার পদচুম্বন করিয়া বলিতেছি. হে ঈশার পিতা, সেই সুমতি, পাপিষ্ঠদের অন্তরস্থ করিয়া দাও। এখনও অনেকটা টান আছে সংসারের দিকে। উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার সম্পর্কে সম্পর্ক বোধ হইয়াছে কি না? ঈশার লক্ষণ জীবনে দেখা গিয়াছে কি না? তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, সে ব্রাহ্মণত্ব কোথায় হেরিব? শুনিয়াছি

একটী পরমহংস আছেন, তাম্র খণ্ড দিলে তাঁহার হাত বাঁকিয়া যায়; বোধ হয়, কে যেন আগুন দিল, কে যেন বিষ দিল; সে পরমহংস তোমার সন্তান।

আমি ত তোমার কাছে শিখিলাম, এখন পরীক্ষা কর। পৃথিবীর এক টাকা হাতে দাও, লক্ষ টাকা হাতে দাও, হয় ত সেই টাকা লইয়া আমরা অকুণ্ঠিতভাবে সংসারে ব্যয় করিব। আমাদের মা বাপ কি সংসারের দোকানদার? আমরা সেই পুরাতন জায়গায় আছি? টাকা ছুঁলাম, হাত বেঁকে গেল না? হাত পুড়ে গেল না? কোথায় স্বর্গরাজ্য, আর কোথায় আমি? কবে যাব দ্বিজদের বাড়ীতে? কবে শ্রীগৌরাঙ্গের মত মত্ত হইয়া নূতন জীবনের পরিচয় দিব? এখনও পুরাতন রক্ত আছে, ধর্ম্মের কবিরাজ বলিতেছেন, এখনও পুরাতন জ্বর যায় নাই, নাড়ী গরম রহিয়াছে; ধর্ম্মবন্ধুদের দেওয়া পয়সা কম হইলে, কি দিতে বিলম্ব হইলে, ধনপিপাসা এখনও টের পাচ্চি। অহঙ্কারের গর্ম্মি এখনও আছে। পুরাতন জ্বর যদি থাকে, পুরাতন পাপের রক্ত আছেই। মরি বাঁচি আর এ রক্ত বক্ষে ধারণ করিতে পারি না। শীঘ্র পরিত্রাণ কর। শীঘ্র পরিত্রাণ কর।

এখনও তোমাকে মা বলে ডাকি না? আরও মা আছে? ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ এমন ভাই, আরও অন্যকে আপনার বলি? কেরে আমার আপনার? আমার মা, তুমিই আমার আপনার; ঐ বিশ্বাসজীবীরাই ভাই, বন্ধু আত্মীয়, কুটুম্ব। হে

হরি, আর পুরাতন জীবন যেন বহন করিতে না হয়; পুরাতন জীবন ঘুচাইয়া দাও। দ্বিজ হইয়া বাঁচি। আমি দেখাতে চাই, আর আমি পুরাতন লোক নই; পুরাতন লোক যে সে মরিয়াছে। আমার বুদ্ধি, বিশ্বাস, আশা আর এক রকমের হইয়াছে। ধর্ম্মচিকিৎসক বলিলেন, আর জ্বর নাই। নূতন জীবনের অনুভব যাহাতে শীঘ্র হয় এই কয়টী লোকের মাথায় হাত রাখিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। করস্পর্শ করিব উপাসনার পর, আর বলিব, কোন দেশ হইতে আসিলে? নববৃন্দাবন হইতে বুঝি? নবকাশী হইতে আসিলে? তোমার গায়ে যে গোলাপের গন্ধ! এই নূতন সুখে সুখী হোক্ আমাদের পরিবার। দ্বিজত্বের উৎসব আমাদের হউক। মা মঙ্গলময়ি, আমরা যেন নবজীবনের আনন্দ অনুভব করিতে পারি। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া এই প্রার্থনা করি, আর যেন সংসারে মরিতে না যাই। নূতন জীবন পাইয়া নববস্ত্র পরিধান করিয়া স্বর্গীয় ভাই বন্ধুদের সঙ্গে যেন মিলিত হইতে পারি, এই আশা করিয়া আমরা তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

প্রত্যাদেশ।

রবিবার ১২ই চৈত্র, ১৮০৪ শক; ২৫শে মার্চ্চ ১৮৮৩।

আজ কাল কি লোকের প্রত্যাদেশ হয়? পুস্তকের ভিতর দিয়া কথা না কহিয়া, গুরুমুখের ভিতর দিয়া উপদেশ প্রদান

না করিয়া, স্বয়ং ব্রহ্ম এই উনবিংশ শতাব্দীতে ভক্তদের সঙ্গে কি কথোপকথন করেন? ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রত্যাদেশের উদাহরণ কি এত পাওয়া যায় যে, তদ্দ্বারা প্রত্যাদেশ সাধারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে? তোমার আমার কি এ জীবনে প্রত্যাদেশ হইয়াছে? এ প্রশ্নের পরিষ্কার মীমাংসা করা আবশ্যক। মীমাংসা না হইলে, হয় আমরা অহঙ্কারী হইয়া পড়িব, নয় কুসংস্কারে আমাদের জীবনতরী চূর্ণ হইয়া যাইবে। যদি ঈশ্বরের দিক হইতে দেখা যায়, তবে পলকের মধ্যেই মীমাংসা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি; কেন না, ঈশ্বর দয়ালু, জ্ঞানী ও সর্ব্বশক্তিমান্। এই তিন গুণেতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আগে যদি দয়া করিয়া মনুষ্যমোহ দূর করিবার জন্য তিনি সাধুদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন, দয়া হ্রাস না হইলে আর তাঁহার সে কার্য্য হইতে বিরত হওয়া সম্ভব মনে করি না।

জ্ঞানের অভাবে প্রত্যাদেশের লোপ হইতে পারে; এখন যদি প্রত্যাদেশ না হয়, হয় ত মানিতে হইবে, তাঁহার আর তেমন জ্ঞান নাই যে প্রত্যাদেশ করিবেন। বুদ্ধি ও মেধার হয় ত হ্রাস হইয়া থাকিবে। দয়া ও জ্ঞান যদি পূর্ণ থাকে, হয় ত আর তাঁহার বল নাই। পূর্ব্বে মনে করিলেই চৌদ্দ লক্ষ লোককে প্রত্যাদেশের অগ্নিতে পূর্ণ করিতে পারিতেন, কোটী লোককে পবিত্রতার অগ্নিতে উজ্জ্বল করিতে পারিতেন, উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরের সে ক্ষমতার হয় ত অভাব

হইয়াছে। এখন পূর্ণদয়া ও পূর্ণজ্ঞান সত্ত্বেও তিনি প্রত্যাদেশ প্রদানে অসমর্থ। কিন্তু আমরা সকলেই জানিতেছি যে ভগবান সেই ভগবান; যে জগন্নাথ সেই জগন্নাথ। অভাব কেমন করিয়া হইবে? কালাতিপাতে পূর্ণতার অভাব হয় না।

তিনি সৃষ্ট জীব নহেন যে তাঁহার হ্রাস হইবে। গত কল্য তিনি যেমন ছিলেন, অদ্যও তিনি তেমনই, আগামী কল্যও তিনি সমান থাকিবেন। তাঁহার দয়া জ্ঞান ও শক্তি কখন খর্ব্ব হয় না। যদি তিনি এক সময়ে প্রত্যাদেশের প্রয়োজন বুঝিয়া থাকেন, আজও বুঝিতেছেন। যে অলৌকিক ভাবে অলৌকিক জ্ঞান প্রদান করিতেন, এখনও সে ভাব আছে; যে জ্ঞানে আগে তিনি সিদ্ধান্ত করিতেন, এখনও তাঁহার সেই জ্ঞান বর্ত্তমান। তবে ঈশ্বরের দিক হইতে ঠিক হইল যে প্রত্যাদেশ দান পক্ষে ভগবানের প্রকৃতি ও মনের ভাব ঠিক আছে। ইতিহাস যদি সত্য বলিয়া মান, তবে এখনও মানিতে হইবে যে. জীবের প্রত্যাদেশ হয়। যদি বল কাহারও হয় নাই; ঊনবিংশ শতাব্দীকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত বলিয়া প্রচার কর, ক্ষতি নাই। সৌভাগ্য এক দিকে, দুর্ভাগ্য অপর দিকে, নববিধানের পক্ষে এরূপ নির্দ্দেশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। পক্ষপাতী হওয়া কখনই হইতে পারে না। প্রত্যাদেশের সৌভাগ্য ছিল যদি, আছে তবে, থাকিবে তবে।

ঈশ্বরের দিক হইতে ত দেখা হইল, এখন মনুষ্যের দিক হইতে দেখা উচিত। প্রত্যাদেশ হইলেও গ্রহণের ক্রটী হইতে পারে। জীবের পক্ষে অক্ষমতা, আলস্য বা অরুচি থাকিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, প্রত্যাদেশ তবে কি? ইহা না জানিলে ত বলিতে পারি না, প্রত্যাদেশ হয় কি না, প্রত্যাদিষ্ট হইতে পারি কি না। আমাদের সকলের মধ্যেই দেখা যায়, কতকগুলি বিষয় আসে এবং কতকগুলিকে আমরা আনয়ন করি। কোন অগ্নি আমরা নিজে আনি, আর কোন অগ্নি স্বর্গ হইতে দেখা দেয়। পূর্ণিমার চন্দ্র আপনি আসিয়া বাড়ী আলো করিল, আর রং মশাল জ্বালিয়া আমরা বাড়ী আলো করিলাম। কোন লেখা আপনি লিখিত হয়, আর কোন লেখা মানুষে লেখে। কোন সময় কলম ধরিলাম, আমার মন কোথায় রহিয়াছে, কে কলম চালাইল, কি সুন্দর লেখা হইল, বুঝিতে পারি না; কলম আপনি চলিতে লাগিল। আর এক সময় আমি নিজে কলমকে চালাই, মস্তিষ্ককে বিক্ষিপ্ত হইতে দিই না, মন অশ্বকে স্থির করিয়া চিন্তাপথে নিয়োগ করি, গম্য স্থানে আস্তে আস্তে যাই।

কার বাড়ী যাইব, কোন্ পথে যাইতে হইবে, সে বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। ক মিনিটে যাওয়া যায় তাহারও নির্দ্ধারণ করা আছে। জ্ঞান মার্গে চলিলাম, বুদ্ধি ঠিক আছে। কখনও পাপে পড়িয়া প্রার্থনা করিলাম পাপ ছাড়িবার জন্য;

পুস্তকাদি পড়িয়া সাধুসঙ্গ করিয়া দুরন্ত রাগকে দমন করিলাম, আর কোন সময় বা সিদ্ধি আপনি সিদ্ধ হইল। বিদ্যুৎ যেমন পড়ে, মেঘের ভিতর দিয়া, সিদ্ধি কখনও কখনও সেইরূপে সমাগত হয়। এই ক্রোধ আসিল, পরক্ষণে দেখি, দুর্গা যেমন আশ্বিন মাসের মূর্ত্তিতে, তেমনই আত্মা দাঁড়াইল মহাসুরের বক্ষে। কার কাছে অস্ত্র লইয়াছিলাম, কিরূপে ধারণ করিলাম, কি প্রকারে নিক্ষেপ করিলাম, কতক্ষণ পাপের সহিত সংগ্রাম হইল, কোন্ দিক হইতে আক্রমণ করা হইয়াছিল, কিছুই জানি না। মূর্চ্ছাভঙ্গ আর জয়লাভ।

কেহ একটী গান করিল, গানের সময় সুর ভাঁজিল, ছাদে গেল, পুষ্করিণীর ধারে গেল, গাড়ী করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গাতীরে গমন করিল, তখনও হইল না; শেষ রাত্রে গলাজলে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; অনেক পরে গুরু উপদেশে গান বাহির হইল। গানগুলিতে শব্দের লালিত্য পাঁচখানা পুস্তক হইতে ধার করিয়া লওয়া হইল। পরের বাগানের ফুল চুরী যেমন, এক এক কবির নিকট হইতে কবিতা চুরী তেমনই। সম্পত্তি তাঁদের, সাজান আমার। নিজ বুদ্ধিতে উৎকৃষ্টতম ছন্দে সঙ্গীতটীকে আবদ্ধ করিয়া শব্দলালিত্য ও ছন্দের মাধুর্য্য দুই মিলাইয়া গঙ্গাজলে গলাজল হইয়া অনেক কষ্টে আশ্চর্য্য গান গাইলাম। সে জন্য কত ক্ষমতা ও আয়াস লাগিল, তবে সিদ্ধ হইল।

আর এক সময় গল্প করিতেছি, মনে হইল একটী গান

হইলে মন বড় সুখী হয়। কিছুই জানি না, হঠাৎ মধুর সুর গলা হইতে বাহির হইল, প্রাণ মোহিত হইয়া গেল। কণ্ঠ কেবল সুরই বিনির্গত করিতেছে। সরস্বতী যেন নিজে আসিয়া ছন্দ শিখাইলেন। বেদ বেদান্ত হইতে গম্ভীর শব্দ সকল আপনা আপনি সঙ্কুচিত হইয়া সিদ্ধ রসনাতে আসিল। কে শিখাইল, বুঝিলাম না। সরস্বতী প্রসাদে স্বয়ংসিদ্ধ, অনায়াসসিদ্ধ, যে কথাই বল, সহজে মধুর গানে সক্ষম হইলাম। কে বা বিদ্যার পথে চলে, গানে নিপুণ হয়, কে বা ধর্ম্মে সুসিদ্ধ হয়, বোঝা যায় না। কতক চলে, আর কতককে দেবতা চালান। কেহ কেহ রসনাকে চালায়, বীণাপাণির হস্তে কেহ কেহ রসনা ও প্রাণকে অর্পণ করেন। বীণাপাণি স্বয়ং বাজাইতে থাকেন। যন্ত্র তাঁর হস্তের হয়। এইখানে প্রত্যাদেশ।

যেখানে লোকে সাঁতার দেয়, প্রত্যাদেশ সেখানে লুপ্ত ; ভাসে যেখানে স্রোতে, যেখানে জীবের শরীরকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইখানে প্রত্যাদেশ। যেখানে মানুষ আপনি আগুন জ্বালিয়া গৃহকে আলোকিত করে, সেখানে প্রত্যাদেশ নাই ; যেখানে স্বর্গের চন্দ্র মনুষ্যকে আলো দেয়, সেইখানে প্রত্যাদেশ। যেখানে ধর্ম্মসাধন করিয়া পাপ জয় করিতে হয়, সেখানে প্রত্যাদেশ নাই ; আর যেখানে সহস্র সহস্র দেবতা আসিয়া একজন হইয়া অসুর বিনাশ করেন, মানুষ বিস্মিত হয়, সেইখানে প্রত্যাদেশ। সকল কার্য্যেরই এই

দুই প্রণালী আছে; সকল মানুষের মধ্যেই এই দুই প্রণালী দেখিতে পাই। প্রত্যাদেশ ও জীববুদ্ধি সকলেতেই কার্য্য করে। সহজে সিদ্ধ আর আয়াসসিদ্ধ, দেবপ্রসাদে লব্ধ ও মনুষ্যলব্ধ সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

যদি মন্দিরের কেহ মনে করেন, আমার ইহার কোন একটী নাই; তিনি হয় অল্পবিশ্বাসী, নয় বড় সত্যবাদী নহেন। যিনি বলেন, ঈশ্বর আমাকে কখনও প্রত্যাদেশ করেন নাই; তাঁহার যে কেবল পাপ জীবন তাহা নয়, রসনাও তাঁহার মিথ্যা কথা কহিতেছে। যেরূপ বলা হইল, এই যদি প্রত্যাদেশ হয়, তাহা হইতে সত্যানুরোধে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেকেরই প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে। কে বলিতে পারেন, কখনও প্রত্যাদেশ হয় নাই? যদি কখনও গান বাঁধিয়া থাক,—একদিন কি সহজে বাঁধ নাই? আর একদিন কি আয়াস সহকারে বাঁধ নাই? যদি পাপ দমন করিয়া থাক, কোন সময় কি সহজে দমন কর নাই? আর কোন সময় কি যত্ন চেষ্টা করিয়া তাহা করিতে হয় নাই? একটী পদ্য রচনা বা গদ্য রচনা কি সহজে কর নাই, আর একটীর সময় কি আয়াস আবশ্যক হয় নাই? এমন বক্তৃতা কি কর নাই, যখন শব্দ তোমাকে ফেলিয়া দৌড়িয়াছে? আর এমন বক্তৃতাও কি কখনও করিতে হয় নাই, যখন তুমি শব্দকে খুঁজিয়া পাও নাই?

কখন বক্তৃতা করিবার সময় বাড়ীতে চেষ্টা করিলাম না,

অথচ দেখিলাম, রেলের গাড়ী যেমন দৌড়ায় তেমনই শব্দ সকল দৌড়িতে লাগিল; আকাশে তাড়িত যেমন ছোটে কথা সকল তেমনই ছুটিতে লাগিল। ভাব সকল আপনা আপনি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। আর কখনও বা অনেকক্ষণ বাড়ীতে বসিয়া বক্তৃতা রচনা করিতে হয়, ভাবিতে হয়। বাস্তবিক এ সত্য খণ্ডন করিতে কোনও ব্যক্তির সাধ্য নাই। প্রত্যেকের হাত ধরিয়া আমি বলিতে পারি, নিশ্চয় তোমারই জীবনে এ প্রকার প্রত্যাদেশের ব্যাপার হইয়াছে। পাঁচটী বার রাগ দমন করিতে অনেক আয়াস লাগিয়াছে; কেন মিথ্যা বলিব যে, তখনও আমার প্রত্যাদেশ হইয়াছে? পাঁচটী বক্তৃতা নিজে করিয়া কেন মিথ্যা বলিব? বস্তুতঃ তখন আমার প্রত্যাদেশ হয় নাই। কিন্তু কোন সময় হরি তোমারও ভিতর উপস্থিত হইয়া বুদ্ধি প্রেরণ করিয়া প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছেন।

অভাগা নর আমি; আমারও ঈশা মুসার ন্যায় প্রত্যাদেশ হইল, এই ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মুসার নিকট ঝোপের মধ্য দিয়া যেমন অগ্নি জ্বলিয়াছিল, তোমার নিকটেও তাহা হইল। কখনও আপনি পথ দেখিয়া লইয়াছ, কখনও চন্দ্রালোক, স্বর্গীয় আলোক তোমাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। কোন না কোন অবস্থায় নিশ্চয়ই প্রত্যাদেশ হইয়াছে। লক্ষ লোকের মধ্যে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। যখন অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিব, দেখিব সকলেরই জীবন

প্রত্যাদেশ পাইয়াছে। কেহ একটী, কেহ এক মাসে একটী, কেহ এক বৎসরে একটী, কেহ বা সমস্ত জীবনে একটী প্রত্যাদেশ পাইয়াছে।

সময়ের অনুকূলতায় প্রত্যাদেশের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, এ কথা মানিতে পারি; কিন্তু এ কথা কখনই মানিব না যে, প্রত্যাদেশ অসম্ভব। যখন মানি মহাকবি কালীদাসও প্রত্যাদিষ্ট, সেক্সপীয়র প্রত্যাদেশবলে কবিত্বে সিদ্ধ; তখন ইহাও মানিব, যে সকল ব্যক্তি আপন চেষ্টায় নয়, কিন্তু ব্রহ্মকৃপায় কবি হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই প্রত্যাদেশ আছে। সামান্য সাহিত্যে যখন এত প্রত্যাদেশ, তখন স্বর্গীয় সাহিত্যে কেন প্রত্যাদেশ হইবে না? গানেও প্রত্যাদেশ আছে। গান শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়, ভগবানের কৃপায় এ গান হইতেছে। বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়, এ ব্যক্তি পুস্তকাদি পড়িয়া বক্তৃতা করে নাই; উপার্জ্জিত জ্ঞানে কৃতবিদ্য হয় নাই; মাতৃগর্ভ হইতে জ্ঞান, শক্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

ঝড়ের সময় এই নৌকা ভাঙ্গিয়া গেল, অল্প ক্ষণের মধ্যে শান্তি উপকূলে উপনীত হইলাম; এইখানে প্রত্যাদেশ। গুরু দশ বৎসর চেষ্টা করিয়া রাগ থামাইতে পারিলেন না; পরিবারের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইল, সেই ঘটনাতেই একেবারে রাগ চলিয়া গেল। এমনই প্রত্যাদেশ আসিল যে, মানুষকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। অতএব সকলে

সতর্ক হইয়া প্রত্যাদেশ প্রতীক্ষা করিবে। কাহার নিকট কখন প্রত্যাদেশ আসিবে, কেহ বলিতে পারে না। মন্দ অবস্থায়, পাপের অবস্থায় যে প্রত্যাদেশ আসিবে না, ইহাও সত্য নহে। শল যিনি পল হইয়াছিলেন, শল অবস্থাতেই তিনি প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন; নতুবা কেমন করিয়া পল হইলেন? জগাই মাধাই পাপের ভিতর থাকিয়াই প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। হীন বুদ্ধি অভাগা বলিয়া আপনাদিগকে প্রত্যাদেশবঞ্চিত মনে করিবে না।

প্রাতঃকালে কখনও, রাত্রিতে কখনও, সম্পদে কখনও, বিপদে কখনও, সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই প্রত্যাদেশ আসিতে পারে। উপাসনা যখন খুব করিতেছ, সে অবস্থায় কখনও প্রত্যাদেশ হইবে; ছয় মাস যদি উপাসনা না থাকে, সে অবস্থাতেও কখনও প্রত্যাদেশ হইবে। মদ ছাড়িয়াছ যখন, তখন প্রত্যাদেশ পাইতে পার; আর মদ খাইতেছ, তখনও প্রত্যাদেশ সম্ভব। শুঁড়ির দোকান হইতে মদ খাইয়া বাহির হইল, প্রত্যাদেশ আসিয়া হঠাৎ সেই ব্যক্তিকে স্বর্গের দ্বারে লইয়া গেল। পুণ্যের অবস্থায় কখনও, পাপের অবস্থায় কখনও প্রত্যাদেশ আসিবে। অলৌকিক ব্যাপার! বিশ্বাসের ব্যাপার! প্রত্যাদেশ হইলে আর কি পৃথিবীকে পৃথিবী মনে হয়? সিংহ ব্যাঘ্র ভয় দেখাইতে পারে না; হিমালয় কোথায় থাকে, প্রত্যাদেশ আসিলে! প্রত্যাদেশের আগুন যখন জ্বলে তখন কে বাধা

দেয়? কোটী শত্রু যদি বাধা দেয়, প্রত্যাদিষ্ট সন্তান কেবল হাসিতে থাকেন। ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মতেজ প্রত্যাদেশের অবস্থায় জীব শরীরে সমাগত হয়। স্বর্গীয় কপোতের আবির্ভাবে নর-হরির মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষু কর্ণ হইতে, হস্ত পদ হইতে আগুন বাহির হইতে থাকে। প্রত্যাদেশ হইলে সমস্ত শরীর অগ্নিময় হয়। নববিধানবাদী প্রত্যাদেশের কাহিনী শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করুন, কখন প্রত্যাদেশ আসিয়া জীবনতরীকে শান্তিরাজ্যে লইয়া যায়।

হে দীনবন্ধু, হে প্রত্যাদিষ্টদের একমাত্র সদ্গুরু, তোমার কৃপাতে আমরা ধর্ম্মেতে সুসিদ্ধ হইব, পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গের আস্বাদন পাইব, এই আশা করিয়াছি। ইহা কেবল প্রত্যাদেশের অবস্থাতেই হইবে। নিজের চেষ্টায় যে ধর্ম্ম বা উপাসনা করি, তাহাতে অহঙ্কার হইতে পারে; সেটুকু সার মনে হয় না; অধিক মূল্যের মনে করিতে পারি না। সাধুদের জীবনের কথা শুনিয়াছি, কেমন অনায়াসে তাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন; সেই সাধু সন্তান বলিলেন, "পাপ দূর হ" অমনই পাপ চলিয়া গেল। আর আমরা পাপ তাড়াইবার জন্য এত কাঁদিতেছি, তবু পাপ যায় না। আমরা ত সেই বংশের সন্তান; আমাদের কেন তেমন হয় না? এক হুঙ্কারে আমরা পাপকে তাড়াইয়া দিব। এখন যে কথা শুনিলাম, এ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেকেই যে প্রত্যা-দেশ পাইয়াছি। পাইয়াও প্রত্যাদেশে অবিশ্বাস করিয়াছি।

তোমার প্রত্যক্ষ কৃপায় যখন পাপ দমন করিয়াছি, তখনও বলিয়াছি আমি করিলাম। দেখ হে ভগবান, যাহারা প্রত্যাদেশ পাইল না, তাহারা কত দুর্ভাগা; আর যাহারা প্রত্যাদেশ পাইয়াও মানিল না, তাহারা আরও দুর্ভাগা।

প্রত্যাদিষ্ট জীবের রক্তে দেবতারা সঞ্চারিত। সে অবস্থায় যে সুখ যদি সর্ষপকণা পরিমাণে তাহা আমাদিগকে দান কর, কৃতার্থ হইয়া যাই। এই দলটী তোমার অনেক দিনের আশ্রিত। শুনিলাম, প্রত্যেকের জীবনেই প্রত্যাদেশ হইয়াছে। বন্ধুরা মানিলেন না; ভাইয়েরা মানিলেন না। যদি মানিতেন, আরও কত প্রত্যাদেশ হইত। না মানিয়া আর পাইলেন না। নূতন বাইবেল প্রস্তুত হইত, তাহা আরম্ভ হইতেছে না। প্রত্যাদেশ! প্রত্যাদেশ! কপোতরূপে আবার এস; বুদ্ধির অভিমানে পৃথিবী গেল; আবার আসিয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ কর। নিদ্রিত ভগবান, অচেতন ভগবান, সমুদ্রে ভাসিতেছেন, থাকিলেই বা কি না থাকিলেই বা কি? যিনি অন্ধকে চক্ষু, বধিরকে কর্ণ দেন, আমরা সেই ভগবানকে মানি। হে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, দর্শন দাও, দর্শন দাও। উড়িব প্রত্যাদেশের আকাশে। ধর্ম্মবিজয় হইবে।

হে ঈশ্বর, হে জগতের সিদ্ধিদাতা, মুক্তিদাতা, আর এক বার তোমার আশ্রিত জীবকে উদ্ধার কর। রসনার ভিতর প্রত্যাদেশের অগ্নি দাও; জীবনবেদ হইতে এক এক অধ্যায়

বাহির করিয়া দেখাইব। নববিধানের পূজা জ্বলন্ত ভাবে আরম্ভ করিব। প্রত্যাদেশের ঝড় তুলিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আলোড়িত, আন্দোলিত কর। বালক যুবা বৃদ্ধ সকলে ক্ষেপিয়া উঠুক। পাগলবংশ দেখাও; মত্ত হস্তীর ন্যায় যে সকল লোক, সেই সকল লোককে দেখাও; একবার বঙ্গদেশকে মাতাইব। জল হইব না; আমরা অগ্নি হইব। বুদ্ধির কুমন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া প্রত্যাদেশের আকারে যথার্থ বেদজ্ঞান লাভ করিব। আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে প্রত্যাদেশের তেজ ও জ্যোতি লাভ করিয়া নববিধানকে জীবনে প্রকাশ করিতে পারি। হে সিদ্ধিদাতা, বিনীত ভাবে প্রণত হইয়া প্রত্যাদেশের চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাকিব। স্বর্গের বলে বলীয়ান হইয়া জ্বলন্ত রাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন করিব, এই আশা করিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীপাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

নববিধানে কৈলাস আবিষ্কৃত।

হিমালয়স্থ সিমলা শিখরে জগতের প্রতি আচার্য্যের শেষ উক্তি।

ভাদ্রোৎসব।

রবিবার ৩রা ভাদ্র, ১৮০৫ শক; ১৯শে আগষ্ট ১৮৮৩।

কলি জিজ্ঞাসা করিলেন নববিধানকে, আর্য্য, যে মহাদেবের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে সে মহাদেব কোথায়

গেলেন? পৃথিবী দুঃখে বিলাপ করিতেছে। না রাজা সুখী, না প্রজা সুখী। না জ্ঞানীর মনে আনন্দ, না মূর্খের মনে সুখ। অন্ধকার আচ্ছন্ন করেছে পৃথিবীর মুখ। মহাদেব কোথায় আছেন? দেবদেব মহাদেব কি কলির পাপ ও দুরাচার দেখিয়া তাঁহার সৃষ্টি ভুলিয়া অন্ধকার স্থানে লুকাইয়া আছেন? তিনি কি মনুষ্যের পাপে বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন? কলি বলিল, আমার জ্ঞানীরা মহাদেবকে কিছুতেই দেখিতে পাইল না; আমার সভ্যতার আলোক মহাদেবদর্শনে সক্ষম করে না। কলির দুর্দ্দশা কেন এমন হইল, এই ভাবিয়া আমি কাঁদি। ঋষিগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিতেন। হে শ্রীনববিধান, কৃপা করিয়া মহাদেবের পথ প্রকাশ কর। কোথায় মহাদেব? এই গভীর প্রশ্নের উত্তর কেবল নববিধান দিতে পারেন। বিধাতা পথিকদিগকে তীর্থ যাত্রায় আনয়ন করিলেন। একজনকে এ পর্ব্বতে, আর একজনকে ও পর্ব্বতে বসাইলেন। নব মন্ত্র উচ্চারিত হইল; নব নদী প্রবাহিত হইল; নব সূর্য্য উঠিল। আকাশে ও পৃথিবীতে নব বিধানের নব আলোক দেখা গেল। অন্ধ দেখিতে পাইল না, দিব্যনয়নে ভক্ত তাহা দেখিলেন। নববিধান সেই তত্ত্ব আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। হে বন্ধুগণ, আমি সেই তত্ত্ব বিষয় তোমাদিগকে বলি, তোমরা শোনো।

মহাদেব একজন সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে

প্রকৃতি সতী। দুয়েতে মিলিত। তিনি যোগেশ্বর আর প্রকৃতি দেবী যোগেশ্বরী। মহাদেব থাকিতে পারেন না সতী ছাড়া, সতী থাকিতে পারেন না দেবক্রোড় ভিন্ন। কিন্তু কি ভয়ানক! দুই পাশে দুই বিকটাকার প্রেত। এ কি? কোথায় এমন সুন্দর দৃশ্য দেখে মনে ভক্তির উল্লাস হবে, কোথায় সতীপতি দর্শনে মনে প্রেমের সঞ্চার হবে, না দ্বারী দেখেই প্রাণ ভয়ে আকুল! তবে কি ধর্ম্মপথ ভয়ে পূর্ণ? মহাদেবের দ্বারী হলেন মৃত্যু। সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিবিশিষ্ট মৃত্যু দেখিয়া কলির মনে হইল, একবার যদি মৃত্যু দর্শন না হয়, তবে মহাদেবের দর্শন কিছুতেই হইবে না। আগে ছাড় পৃথিবীর লালসা কামনা, তবে পূর্ণমনোরথ হইয়া মহাদেবের সদনে উপস্থিত হইবে। জান না কি যে মহাদেব আপনার কাছে সমস্ত পৃথিবীর সুখ রাখিয়া দিয়াছেন? তবে কৈলাস খুঁজিতেছ কেন? ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান কর, আপনার কামনা লালসা পরিবর্জ্জন করিয়া হিমালয়ে দাঁড়াও। কৈলাসে মহাদেবের বাস; অথচ আমরা সেই স্থানে আসিয়া ঘুরিতেছি। যাহারা মৃত্যু অপেক্ষা জীবন ভালবাসিলেন তাঁহাদের কিছু হইল না।

হা কৈলাস, মহাদেব ও মহাদেবীর আবাসস্থান, এই যে তোমাকে আমরা খুঁজিতে আসিয়াছি। সমুদয় হিমালয় ক্রমে ক্রমে অনুসন্ধানের বিষয় হইল। সকলেই দেখিল সেই ধবলাগিরি, সেই নির্ঝরিণী, সেই খড, সমস্তই দেখিল। কিন্তু

জীব কাঁদিল, বলিল মহাদেব কৈ? আমরা এখন ইহা বুঝিয়াছি ও সেই রহস্য কথা সাহসপূর্ব্বক পৃথিবীকে বলিতে পারি। মহাদেব এই পাহাড়ে আছেন, এই স্থানে তিনি বসিয়া আছেন। কিন্তু সমস্ত দ্বার অবরুদ্ধ; কে যেন অবিশ্বাসের অন্ধকার দিয়া সকল ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আমরা কি কৈলাসের সমাচার না লইয়া, নিরাশ হইয়া, কলিকাতায় ফিরিব? আমরা কৈলাসের সুসমাচার কলিকাতায় বলিব, আমরা বেদবেদান্তের গভীর সত্যের সাক্ষী হইব, এই জন্য তীর্থভ্রমণে আসিয়াছি। ঈশ্বর ধন্য! ঘোর কলির অন্ধকার মধ্যে তিনি যে অন্ততঃ কয়েকজন ভক্তের হস্তে কৈলাসের চাবি দিলেন, ইহা কলির পক্ষে বড় সামান্য অনুগ্রহ নহে। সাধন না করিলে কিরূপে সেই ব্রহ্মরত্ন লাভ হইবে? আমরা তো সেই পবিত্র হিমালয়ের কাছে শরণাপন্ন হইয়াছি। এখন কি আমরা কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিব?

শুনিয়াছি, এই যক্ষ পর্ব্বতে কুবেরের অনন্ত রত্নরাশি ছিল, এই সকল পাহাড়ে তাঁহার রাজ্য ছিল। আমরা হিন্দুজাতীয় পুরাতন কথা কেন অগ্রাহ্য করিব? এই স্থানেই সমুদয় দেবতাদিগের আবাসস্থান, উচ্চ গভীর চিন্তার স্থান এই হিমালয়। সুতরাং যিনি যোগেশ্বরের মহাদেব তিনি এ স্থান ছেড়ে কেন অন্য স্থানে আবাস স্থাপন করিবেন? তাই বলি, তোমরা এবার কৈলাস না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিও না। নইলে তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, বধূ সকলে তোমা-

দিগকে ধিক্কার করিয়া বলিবে, দেবীর বাড়ীর কাছে গেলে, মহাদেবের মন্দিরের কাছ দিয়া প্রত্যহ আফিসে যাইতে, আর তাঁহাদের কোন সংবাদ আনিতে পারিলে না? গেলে তীর্থ স্থানে, আর দেবীকে না দেখে শূন্য মনে ফিরে এলে? ধিক্ ধিক্ সংসারী! তোমরা সিমলা পর্ব্বতে গেলে যেখানে মহাদেব বাস করেন, দেবদেব মহাদেবের রাজ্য থেকে আমাদের জন্য কিছু রত্ন আনিতে পারিলে না; ধিক্ ধিক্ তোমাদিগকে!

সত্য কথা, যেখানে একটীবার দেব বলিবামাত্র কোটী পর্ব্বত দেবদেব মহেশ্বর বলিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠে; যেখানকার সূর্য্য সুবর্ণ চন্দ্রও সুবর্ণ, সেইখানে আমরা বসিয়া আছি যদি হিন্দুগৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে ভাই এস, হাত ধরে লইয়া যাই। এই দেখ পূর্ব্ব, ঐ পশ্চিম, ঐ উত্তর, ঐ দক্ষিণ। দেখ সারি সারি গিরিশ্রেণী, অনন্ত, অসংখ্য, অগণ্য গিরিশিখর কিন্তু কেবলই পাথর। পাথর কি মহাদেব? না। পাথরে মহাদেব। মহাদেব পাথর চাপা। পাথর কি মহাদেবকে দেখাইতে পারে? তবে একতারা লইয়া বাজাইব, যোগতীর মারিয়া এই সমস্ত পাথর দ্বিধা করিয়া ফেলিব। অদ্যকার উৎসব ভারতের নিকট, পৃথিবীর নিকট প্রচার করুক যে কৈলাস আবিষ্কৃত হইল।

মহাদেব বৈরাগী হইয়া ভিক্ষা করিতেছেন, প্রকৃতিকে ক্রোড়ে লইয়াছেন। যেমন পাথরখানি খুলিল, আর সোণার

স্বরে দেবদেবীর যুগল মূর্তি প্রকাশ হইল। যতই পর্ব্বতের লক্ষণ পুস্তকে অধ্যয়ন করি, ততই এই কথা সপ্রমাণ হয়। পর্ব্বতের ভিতরে পার্ব্বতী শক্তি, গিরিজ্যোতি। এখানে যেমন বাতাস, এখানকার যেমন সুন্দর ফুল, এখানকার যেমন সুন্দর চাঁদ, এমন আর কোথায় আছে? এখানকার নির্ঝরের যেমন শব্দ, ইহার তুলনা কি আর কোথাও পাওয়া যায়? মহাদেব, তোমার স্ত্রী প্রকৃতি যথার্থই এখানে বাস করেন। হে সম্মুখস্থ ফুল, হে কুসুমশোভা, তোমরা কোথা হইতে এমন লাবণ্য পাইলে? এমন কোমলতা এ পাথর হইতে কে বাহির করিল? নির্ঝরের পার্শ্বে যখন তোমাদের মনোহর লাবণ্য বিকাশ কর, তাহা দেখিয়া মন প্রাণ বিভুচরণের দিকে আপনা আপনিই ধাবিত হয়। প্রকৃতি দেবী কেমন আস্তে আস্তে নির্ঝরিণীতীরে বীণা বাজাইতেছেন! কেমন ফুলগুলিকে মালা গেঁথে রেখেছেন। কেন না তাঁহার ভক্তেরা এসে গলায় পরিবে। মা প্রকৃতি দেবী, যথার্থই তুমি এ স্থানে বিরাজ করিতেছ। তোমার শ্রীপদে সহস্র সহস্র নমস্কার।

প্রকৃতির পাশে সেই বৈরাগী মহাদেব বসিয়া আছেন। সভ্যতা ধিক্কার করে বলে এত বড় রাজা ঝুলি কাঁধে করে ভিক্ষা করিতেছেন! বাস্তবিক পৃথিবীর কল্যাণের জন্য যদি কেহ বৈরাগী হইয়া থাকেন তো তিনি মহাদেব। মহাদেব কেবল অষ্টপ্রহর বলিতেছেন, জীব, তোদের কল্যাণ হউক!

ছেলে হবে সুখী, এইজন্য পিতা হলেন ভিখারী। ব্রহ্মেতে না বাসনা, না কামনা। তিনি পরিচ্ছদ বা ধন বা ধান্যের প্রয়াসী নহেন। তিনি তো সর্ব্বত্যাগী, আবার আপনাকেও ত্যাগ করিলেন। ভক্তকে বলেন "তুই কি মনে করেছিস্ আমি আমার ভক্তকে কেবলই বিশ্ব দিই। আমিও যে ভক্তেরই। আমার টাকা কড়ি সমুদয় আমার ভক্তের উপর লিখিয়া দিই। সমস্ত দিলাম। কেবল শেষে বাকি রহিলাম আমি, আমাকেও তুই নে। তোর কাছে থাকিব আমি। তোর যখন যাহা দরকার হবে আমি তাহা আনিয়া দিব। তোর যখন হবে রোগ শোক, তখন তোর কাছে বসে গায়ে হাত বুলাইব। আমি তোর সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় হয়ে রহিলাম। তোর কাছে সেবকের মত দিন রাত্রি হাজির রহিলাম। যখন "আমার মহাদেব কৈ?" বলিয়া ডাক্‌বি, তখনই তোর কাছে আস্‌ব। কেন না, ভক্ত আমার বড় আদরের ধন। পাঁচ জন ভক্তকে দেখিলেই আমি সুখী হই। আমি মেঘকে বলেছি, আমার ভক্তের ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিতে; ফুলকে বলেছি, ভক্তের গলায় মালা হয়ে ঝুলিতে; চাঁদকে বলেছি, ভক্তের মাথায় সুন্দর জ্যোৎস্না দিতে; আর সূর্য্যকে বলেছি, ভক্তের ঘরে আলোক দিতে।"

আহা কি সুমিষ্ট কথা! কি চমৎকার প্রেম! এক দিকে সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্ম, আর এক দিকে প্রকৃতির সমস্ত ধন ও রত্ন। আহা, দেখ দেখ! আমরা যে শ্মশান দেখিয়া ভয় পাইতাম,

তাহারই ভিতর কেমন লাবণ্য, কেমন সৌন্দর্য্য! আমরা আজ এই উৎসবে মহাদেব মহাদেবীর বিবাহ দিই। এস ত দেবদেবী! একবার তোমাদের দুই হাত এক কর ত। দাও, দেব, তোমার হস্ত; দাও, দেবী, তোমার হস্ত। আজ আর সিম্‌লা, তুমি আমাদের কার্য্যালয়ের সিম্‌লা হইলে না। আজ তোমাকে সুন্দর দেখিলাম। নববিধানে দেব ও দেবীর বিবাহ দেখিলাম। বৈরাগ্য হাসেন প্রকৃতির মুখ দেখে, আর প্রকৃতি হাসেন মহাদেবের মুখ পানে চেয়ে। আমরা চিরকাল মহাদেবভক্ত। বুঝিলাম, এই সমুদয় হিমালয়ে কৈলাস ছড়াছড়ি। আমার মা প্রকৃতি দেবী, আমার পিতা পরব্রহ্ম মহাদেব, এখানে ওখানে চারিদিকে রহিয়াছেন। কৈলাস এবার চতুর ভক্তের হাতে পড়েছ। কলিকাতা হইতে এক দল চতুর ভক্ত এসেছে। তোমাকে এবার লজ্জা দেব। বড় যে চারি হাজার বৎসর লুকাইয়াছিলে!

সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কৈলাস কোথায়? কাশ্মীরে, না সিম্‌লায়? সকলেই বলে, লাল পানি দেখিলাম, খড়ে গেলাম, কৈ কৈলাস ত দেখিলাম না! দার্জিলিঙ্গে গেলাম, নৈনীতালে গেলাম কৈলাস তো কোথাও দেখিতে পাইলাম না! তবে কি কলিতে কৈলাস কর্পূরের ন্যায় উপে গেল? ওহে হিমালয়, আর কৈলাসকে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না। আমরা যোগের আলো লইয়া সমস্ত পাহাড় রাত্রিতে ও দিনেতে অনুসন্ধান করিলাম। কত খুঁজিলাম, মহাদেবের

৫

ঠিকানা পাইলাম না। স্ত্রীকে নাকি পতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রী কোন না কোন প্রকারে বলিয়া ফেলেন। বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ফুলকে জিজ্ঞাসা করিলাম মহাদেব কোথায়? প্রকৃতি হাসিলেন। যেমন হাসিলেন, আমি অমনি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম। শুনিয়াছি মেয়ে মানুষের মনে কথা চাপা থাকে না। বল মা, তোমার বাড়ী কোথায়? অন্নপূর্ণা, চারি হাজার বৎসর হইল ভারত কিছু খায় নাই। ভারতের কান্না শুনিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "পিতা পিতা বলিয়া কত লোকে ডাকিয়াছে, কিন্তু পিতা ত অগ্রে আসেন না। তোরা তাই জেনে বুঝি কলিকাতায় বসিয়া মা, মা বলে অত ডাক্‌তিস্? তোরা নববিধানের ভক্ত। আমি তখনই ভাবিয়াছিলাম যে, যদি এই চোর ডাকাতের দল একবার হিমালয়ে আসে, তা হলে কোন দেবতার ঘর আর লুকান থাকিবে না।"

সকল দেবতাই জানেন যে চতুর ভক্তের মত প্রাণ কেড়ে নিতে আর কেহ পারে না। প্রকৃতি বলিলেন, "ঐ দেখ, ঐ দেখ, হিমালয়ের দ্বার খুলিয়াছে। ঐ দেখ, আলোকের দ্বার। ঐ যে সতীপতি বসিয়া আছেন! ঐ দেখ, কেমন আমি মহাদেবপার্শ্বে বসিয়া হাসিতেছি। কিন্তু মহাদেবের মুখে গাম্ভীর্য্য। আমরা দুইটী নই, কিন্তু একটী। আমাদের যেখানে পূজা হয়, আমাদের ছেলেদের সেখানে লইয়া যাইব। আমাদের প্রতিজ্ঞা যে, যে বাড়ীতে যাব ছেলে-

গুলিকে সাজাইয়া সঙ্গে লইব। বৎসরকার দিনে দুঃখী ভারতবাসীদের কাছে আমাদের পরিবারটীকে সাজায়ে লয়ে যাই। কিন্তু এত দিন আমাদের বাড়ী কেউ দেখ্‌তে পায় নাই। ওরে এত দিন পরে আমাদের ঘর বাড়ী লুকান ত রহিল না। সমস্ত ছেড়ে দিয়ে পাহাড় আশ্রয় কর্‌লাম। উচ্চ হইতে উচ্চতর গিরিতে গেলাম, এখানেও এল। যাক্ কলিতে তবে আমাদের প্রেমের হার হইল। এখন হইতে প্রকৃতি ও মহাদেব যেখানে বসিয়া কথা কহিবেন, সেখানে ভক্তগণ একেবারে যাইয়া রসস্ত কথা শুনিবে।" হে বন্ধুগণ, তোমাদিগকে আমরা বিনীত ভাবে বলিতেছি, সহজে পাথরের মধ্যে পাথর চাপা ব্রহ্ম আমাদের হইলেন, তোমাদেরও হইবেন। তোমাদের পায় পড়ি তোমরা একবার সাধন আরম্ভ কর। নববিধানের সুপ্রভাত হইল। দেবীর কথা শুনিলে। এইবার আনন্দ মনে সপরিবারে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ কর। আর গুরুর দরকার নাই।

হে দীন দয়াল, হে ভারতসন্তানদিগের একমাত্র আশা ভরসা, প্রাচীন ভারতের অনেক গৌরব ছিল। তখন কৈলাসধামে বড় কাণ্ড কারখানা হইয়া গিয়াছে। তখন ভক্ত ঋষি যোগীরা তোমার কত খেলা দেখিতেন। কোথায় গেল সে সুদিন? একবার, হে নাথ, সেই কৈলাস দেখাও। ভারত কাঁদে, বঙ্গ কাঁদে। হে জগদীশ্বর, একবার তোমার দ্বার খুলিয়া দাও। কৈ হিমালয়ে আর হিমালয় রহিল

না। ঐ যে মা প্রকৃতি দেবী ঘরের ভিতরে বসে হাসছ। এ ত পাহাড় নয়। এ ত ব্রহ্মের মায়াস্বরূপ। পাথরের ভিতর আর পাথর নাই, কেবল জ্যোতি। তোমার সুন্দর সোণার ঘর তাহার ভিতরে। ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ, সকলে ত এ ঘরে জুটেছেন। হে ভক্তজননী, তুমি এই সমুদয়কে আশ্রয় দিয়া কত সুখে রাখিয়াছ! কলিকাতা, মনকে টানিও না। নীচ দেশ, মনকে কলুষিত করিও না। যেমন জ্যেষ্ঠ ভাইগুলি মার পাশে নাচিতেছিল, হায়, কবে আমরা সেইরূপ ওদের সঙ্গে মিশিয়া এইরূপে নাচিব। হে ঈশ্বর, তুমি কলির মানুষকে এত ভালবাসিলে। এই পাহাড়ে লোকে কাঠ কাটে, পাথর ভাঙ্গে সকলই টাকার জন্য। মা, এই পাথরের মধ্যে তুমি বসে আছ। কত শেল তোমার বক্ষে মেরেছে। মানুষ তোমার এই সুন্দর পবিত্র পর্ব্বতে এসে পাপ অধর্ম্ম কত করিতেছে। একবার ত জিজ্ঞাসা করে না কাহার রাজ্যে এসেছে? বলে এ সব সাহেবদের বাড়ী, এ স্থান তাহাদের কর্ম্মের স্থান। সোণার লক্ষ্মী তুমি এই সকল পাথরের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছ। তবে পৃথিবী কেন মা নাই, বাপ নাই বলিয়া বিলাপ করে? হে মা, তুমি যে আছ বজ্রধ্বনিতে তাহা একবার প্রচার কর। একবার বল যে এই পাহাড়ে মহাদেবের বাসস্থান। সকল দিক জ্যোতির্ম্ময়! কি আশ্চর্য্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য! সৌন্দর্য্য দেখে পৃথিবী কৃতার্থ হউক! হে দেবী, একবার প্রসন্ন নয়নে

আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন কখন লালসার কুটিলতা মনকে না কলুষিত করে। একবার যদি চারি হাজার বৎসর পরে কৈলাস দেখা দিলে তবে কথা কও যেন ভারত ভুলে যায়। হে কৃপাময়ী, এই উৎসবদিবসে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, কৈলাসের সন্ধান পাইয়াছি, এবার হইতে মার চরণে বসে কৈলাস সম্ভোগ করিব। হে মঙ্গলময়ী, তোমার সুকোমল সুনির্ম্মল শ্রীচরণ আমাদের পাতকী সংসারপ্রিয় মস্তকের উপর স্থাপন কর। হে জননী, প্রকৃতির হাসিতে আমি চির-কাল হাসিব; প্রকৃতির স্তনের দুগ্ধকে আমার প্রাণসর্ব্বস্ব করিব, যোগেতে যোগেশ্বরীর সঙ্গে এক হয়ে যাব; এবার থেকে কৈলাস ছাড়া আর হব না; আমার প্রাণের ভিতরে কৈলাস সদা হাসিবে। আমি হাতে করে মহাদেবকে সদা রাখ্‌ব; আমার বাড়ী এই কৈলাস হইবে; এই আশীর্ব্বাদ তুমি কর। আমি যে শ্মশানের ভিতর দিয়া প্রকৃতি দেবীকে লাভ করিলাম। আমি এবার থেকে আর অন্য কাহাকেও পূজা করিব না। আমার কথাটা বিশ্বাস করে সকলে দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য এখানে আসিবেন। ওগো দেবী, তুমি দয়া করিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যে যেখানে আছি সকলে প্রাণে প্রাণে মিলিত এবং এক হয়ে তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

যেখানে ঈশ্বর সেখানে ভক্ত।

রবিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক; ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭।

ভক্তি শাস্ত্রের একটী কথা যোগশাস্ত্রের সাহায্যে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। মতটী ভক্তিশাস্ত্রের; কিন্তু যে আলোকে তাহা বুঝা যায় তাহা যোগ শাস্ত্রের। যখনই মনুষ্য ঈশ্বরকে ডাকে, তখন সে বুঝিতে পারুক আর না পারুক ঈশ্বর সশিষ্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ভক্তের নিকট ঈশ্বর একাকী দেখা দেন না। ভক্তবৃন্দ সহ তিনি দেখা দেন। তিনি যখন আবির্ভূত হন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাধু ভক্ত সুসন্তানগণও প্রকাশিত হন। ইহার গূঢ়তত্ত্ব কি? কেন ঈশ্বর ভক্তদিগকে লইয়া আসিবেন? যোগশাস্ত্রে কথিত আছে, যোগ দ্বারা সাধকের প্রাণ ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রথিত হয়। যোগ সহকারে যোগী ঈশ্বরকে ক্রমে ক্রমে প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ফেলেন। যেখানে যোগী বসিয়া আছেন, সেখানেই পরমাত্মা। যোগীর হৃদয় ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট, অতএব অন্যান্য যে সকল যোগী ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাও যোগীর সঙ্গে গ্রথিত। যেখানে ঈশ্বর সেখানে তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ বসিয়া আছেন। যেখানে ঈশ্বর সেখানে ভক্তবৃন্দ, যেখানে ভক্তবৃন্দ সেখানে ঈশ্বর।

স্বর্গ কখনও খালি হইয়া আছে, ইহা, ভাবিতে পার না। অতএব ইহা সত্য কথা যে ঈশ্বরকে ডাকিলে তাঁহার সঙ্গে

তাঁহার ভক্ত সাধকগণও আসেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নরক অভক্ত ভাবিতে পার না। ভক্তকে প্রত্যাহার করিলে ভক্তবৎসলকে পাইবে না। ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই, স্বর্গের ঈশ্বরকে, ভক্তবৃন্দের ঈশ্বরকে ভাবিতে হইবে। স্বর্গে দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, যোগী প্রভৃতি ঈশ্বরের পার্শ্বস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তগণের হৃদয়ে বিহার করিতেছেন। কোন্ ভক্ত কোন্ জাতির প্রতিনিধি, কি কি নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন এবং কি নামে তিনি স্বর্গে আখ্যাত তাহা আমরা জানি না; কিন্তু এই জানি ঈশ্বরকে আদর করিলে তাঁহার ভক্তদিগকে আদর করিতেই হইবে। সকল জাতি এবং সকল যুগে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত যত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সকলেই ভক্তহৃদয়ে শুভাগমন করেন।

কেহ কেহ কেবল এক একটী ভক্তকে জানেন এই জন্য তাঁহারা বলেন, যখন ঈশ্বর আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন তখন তাঁহার সঙ্গে আমাদের অমুক ভক্তিভাজন আচার্য্য, অমুক ভক্তবন্ধু আসিবেনই আসিবেন। ঈশ্বর সেই ভক্তকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, সেই ভক্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা অন্যান্য ভক্তদিগের তত্ত্ব জানেন না, অতএব সমুদয় ভক্ত যে ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারেন না। ভক্ত ভক্তবৎসলের সঙ্গে আছেন, এই জন্য যত ভক্তকে ভক্তি করি তত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি

বৃদ্ধি হয়। আবার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হইলে ভক্তের প্রতিও সমাদর বৃদ্ধি হয়। এইরূপে ভক্তিসাধন দ্বারা সমুদয় ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বর কিরূপে সংযুক্ত আছেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত দেখ স্বর্গের একজনকে পাইলেও কত রত্ন পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে না দেখিতে পাইলে কোন ভক্তকে পাওয়া যায় না। ভক্ত বলিয়া আমরা যে একটী মনুষ্যকে পূজা করিব তাহা নহে। আমরা কেবল ঈশ্বরকেই ডাকিব।

আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, ঈশ্বর তাহা প্রশস্ত করিয়া লইবেন, এবং তাহাতে তাঁহার ভক্তদিগের স্থান করিয়া দিবেন। আমাদের মন ক্ষুদ্র, আমরা কোন ভক্তের নাম শুনিতে চাই না; কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের হৃদয়কে প্রশস্ত করিবেন, তখন সেই অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ভক্তিভাজন হইয়া উঠিবেন। সেই রক্ত মাংসের পিণ্ড মানুষ আমাদের ভক্তিভাজন নহেন, কিন্তু তাঁহার আত্মার ভক্তিভাব আমাদের ভক্তি উদ্দীপন করিবে। পৃথিবীতে ভক্তের কি নাম ছিল তাহা নাই জানিলাম, আমাদিগের পক্ষে এই পর্য্যন্ত জানিলেই হইল, অমুক ব্যক্তি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য স্বার্থ এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন, অমুক লোক পতিতদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আশ্চর্য্য ক্ষমা, ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা সহকারে আত্মজীবন দান করিয়াছিলেন, অমুক ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিবামাত্র মত্ত হইয়া যাইতেন, অমুক

সাধক দিবা নিশি প্রগাঢ় ধ্যান যোগ সাধনে মগ্ন থাকিতেন। অমুক লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, এবং সকলের পদানত বিনীত দাস হইয়াছিলেন।

কাহার বুকের ভিতর স্বর্গের কি ধন আছে তাহাই আমরা দেখিব, তাঁহাদের নামে আমাদের প্রয়োজন কি? ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যাঁহার মনে ব্যাকুলতা এবং বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তিনি একজন ভক্ত, তাঁহার আর কিছু জানিবার আমার আবশ্যক নাই। পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে তিনি একজন ভক্ত: ঈশ্বরের নামরসে যাঁহার মন গলে তিনি একজন ভক্ত। ঈশ্বর সহবাসে যিনি বসিয়া থাকেন, ঐ সহবাস যাঁহার ভাল লাগে, তিনি একজন ভক্ত যোগী। ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিবার জন্য যিনি আপনার ভাই ভগিনীদিগের সেবা করেন তিনি একজন ভক্ত। ইহাঁদের সকলকেই ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে লইয়া বসিয়া আছেন, ইহাঁদের একজনকেও অভক্তি করিলে ঈশ্বরকে অভক্তি করা হইবে।

যে পরিমাণে আমাদের ভক্তি বৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে ইহাঁদের সঙ্গে নিগূঢ় যোগ হইবে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িলে, ইহাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধা বাড়িবে। যতটুকু আমরা ভক্ত হইব, ততটুকু আমরা অন্য ভক্তকেও ভক্তি করিতে শিখিব। ঈশ্বরের জন্য যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্যাগী

হইয়াছেন, তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব; ঈশ্বরের নামে যিনি মত্ত তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব। ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য, বিনয়, বিশ্বাস, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, প্রেম, নির্ভর, আনুগত্য,—যে কোন ব্যক্তির জীবনে এ সকল ভক্তির লক্ষণ দেখিব তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব। ঈশ্বর মধ্যস্থলে সশিষ্য বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখের প্রকাশ ভক্তদিগের মুখে দেখিব। যত ভক্তদিগকে ভক্তি করিব তত ভক্তবৎসল আমাদের আয়ত্ত হইবেন, অতএব কোন ভক্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চেষ্টা করিও না। প্রাণ যদি ঈশ্বরকে দাও তিনি যদি তোমাদের প্রিয় হন, তাঁহার সমস্ত ভক্তগণও তোমাদের প্রিয় হইবেন, কেন না ভক্তদিগের সঙ্গে তাঁহার নিগূঢ় যোগ। এই জন্য প্রথমেই বলিয়াছি, যোগশাস্ত্র দ্বারা ভক্তিশাস্ত্রের একটী সত্য স্পষ্টতররূপে বুঝা যায়।

ব্রহ্মতেজ।

রবিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক; ৪ঠা মার্চ্চ ১৮৭৭।

মনুষ্য ঈশ্বরের অংশ এ কথা বলা ঠিক নহে। এ কথা যথার্থ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। ইহা নীতি এবং সত্যবিরুদ্ধ। এই মতে অহঙ্কার আছে। ঈশ্বর একটী প্রকাণ্ড অগ্নির ন্যায়, তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিলে, যে ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়, তাহা মনুষ্য আকারে জন্মগ্রহণ করে।

এই সমুদয় অগ্নিকিরণ একত্র করিলে আবার একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য হয়, এই মত ভ্রমাত্মক। কিন্তু ইহা সত্য কথা যে মনুষ্যের আত্মাতে পরমাত্মার অগ্নি আছে। যে পরিমাণে সেই অগ্নির উজ্জ্বল দীপ্তি, সেই পরিমাণে মনুষ্যের গৌরব। মনুষ্য ঈশ্বরের অংশ নহে; কিন্তু মনুষ্যের আত্মাতে ব্রহ্মাগ্নি নিহিত আছে। আত্মা তেজোময়, যখন আত্মা সেই তেজো-বিহীন হয় তখন আত্মার মৃত্যু হয়। সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখ প্রাণের মধ্যে সেই ব্রহ্মাগ্নি আছে কি না। এই ব্রহ্মাগ্নি, এই তেজ, এই উদ্যমই আত্মার সর্ব্বস্ব। পাপ বিনাশের ক্ষমতা এই তেজ। উপাসনা সাধনাদি দ্বারা এই তেজ বৃদ্ধি হয়। তেজ বৃদ্ধির অর্থ পুণ্য প্রেম বৃদ্ধি।

মনকে তেজেতে রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত। তেজের হ্রাস হইবার একটী কারণ বয়োবৃদ্ধি। যত বয়স বাড়ে, তত সেই তেজ ম্লান হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে যেমন শরীর শীতল হইয়া আসে, তেমনি আত্মাও শীতল হয়, ইহা ভয়ানক কথা। ইহা যদি সত্য কথা হয় তবে ধর্ম্ম যে উন্নতি-শীল, ইহা আমরা মানিতে পারি না। যে মত আত্মার উন্নতি এবং পরলোক অস্বীকার করে তাহা অবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। যাহারা বলে যুবা বিদ্যা, ধর্ম্ম, পুণ্যে তেজস্বী হইতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধের তেজ কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, তাহারা অবিশ্বাসী হয়। যুবা যখন বার্দ্ধক্যের মুখে পড়িল, তখন তাহার সমুদয় গুণ নিস্তেজ হইল। যৌবনে যতক্ষণ সেই

তেজ থাকে, ততক্ষণ পাপ আসিলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সেই পাপকে তাড়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু বৃদ্ধকালে আর সেই তেজ থাকে না।

যতক্ষণ উপাসনা করিবার ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ ভয় নাই, ততক্ষণ সমুদয় বিঘ্ন বিপদ দূর করিয়া দিতে পারি। কিন্তু যখন উপাসনা করিবার শক্তি হ্রাস হইল, তখন আত্মা বলবীর্য্যবিহীন হইয়া পড়িল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে উপাসনার তেজ হ্রাস হইবে ইহা যদি সত্য কথা হয়, ইহা ভয়ানক কথা। আজ আমরা সজীবভাবে উপাসনা করিয়া হাসিতেছি, উপাসনার তেজে বিপদকেও তাড়াইয়া দিতেছি; কিন্তু বার্দ্ধক্যের মত মানিলে এমন সময় আসিবে যখন আত্মা শিথিল, অলস, নিরুদ্যম এবং নির্জীব হইয়া পড়িবে। ইহা মরিবার কথা, এই কথা ঠিক নহে। যথার্থ কথা এই, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেজ হ্রাস হয় না, তেজ বৃদ্ধি হয়, কত উপাসনা গভীরতর হইবে, ক্রমাগত আত্মার মধ্যে সেই তেজ উজ্জ্বলতর হইবে।

তপস্বীদিগের শরীরের চারিদিকে পবিত্র তেজ এবং স্বর্গীয় প্রভা নির্গত হইতেছে, শত্রুতা সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হয়; এই কথার ভিতরে আমরা এই সত্য গ্রহণ করিতে পারি, যত দিন তপস্যার বল আছে তত দিন কোন ভয় নাই। তপস্যার তেজ নির্ব্বাণ হইলেই বিপদ, তখন মনুষ্য এই প্রকার বিপদে পড়ে যে, সে চেষ্টা করিলেও

আর উঠিতে পারে না, তাহার আর দুর্গতির সীমা থাকে না, সে কোন মতেই তাহার মনকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আনিতে পারে না. তাহার পাপগুলি আর দমন করিতে পারে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিব শরীরের বার্দ্ধক্য আসিলে আত্মার তেজ, আত্মার তপস্যার বল কমে না, তবে অল্প বিশ্বাসীর তেজ হ্রাস হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত বিশ্বাসী এবং নিত্য সাধন করেন, তাঁহারা মৃত্যু শয্যাতে আরও উজ্জ্বলতর দীপ্তি প্রকাশ করিতে থাকেন, তাঁহাদের ব্রহ্মতেজ যায় নাই।

যে বস্তু অনন্তকালের ব্যাপার তাহার উপরে কালের মৃত্যুর আধিপত্য নাই। দেহের সঙ্গে আত্মাও দুর্ব্বল হয় ইহা মিথ্যা কথা। বৃদ্ধকালে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ দৈহিক বল ক্ষয় হয়, কিন্তু আত্মার তেজ বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মবলের তেজ যেখানে সেখানে কালের কোন ক্ষমতা নাই। ব্রহ্মতেজে যিনি তেজস্বী তিনি মৃত্যুশয্যায় বলেন, শমন আমি তোমার ধার ধারি না, আমার উপরে তোমার কোন অধিকার নাই। মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর আমার মন্ত্রদাতা, দীক্ষাদাতা গুরু; মৃত্যু, তুমি আমার কি করিবে? আমি তোমার দ্বারা কখনই পরাস্ত হইব না। অতএব যে বল, যে ব্রহ্মতেজ সাধন দ্বারা বৃদ্ধি হয় তাহাই আমাদের প্রার্থনীয়। শরীর ক্ষয় হউক না কেন, শরীর যখন নষ্ট হয় তখনই ত আত্মা স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে। পিঞ্জর ছাড়িয়া যখন পাখী উড়ে তখনই ত ডানায় অধিক বল প্রকাশিত হয়।

অবিশ্বাসীরাই কেবল এই কথা বলে,—আগে আমাদের উপাসনা ধ্যান যত দ্রুতবেগে চলিত এখন আর তেমন হয় না, এখন অধিক বয়স হইয়াছে এখন অধিকক্ষণ ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে কষ্ট হয়। বিশ্বাসী বলেন যত বয়স বৃদ্ধি হইতেছে তত ঈশ্বরের সঙ্গে গাঢ়তর ঘনিষ্ঠতার যোগ হইতেছে। যৌবনকালে আধ ঘণ্টা কঠোর সাধন করিলে ঈশ্বরের দর্শন পাইতাম, এখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার দর্শন লাভ করি। বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া যৌবনকালের সাধক লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। শরীর শীর্ণ হইল বলিয়া কি নিরপরাধ আত্মা উপাসনা করিতে পারিবে না? শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি নিরপরাধ আত্মাকে ঈশ্বর বধ করিবেন? শরীরের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে বলিয়া কি আত্মার চক্ষে ভক্তি প্রেমের অশ্রু পড়িবে না? যদি তুমি ভক্ত হও, তোমার শরীর যত শীর্ণ হইবে তোমার আত্মা তত অধিক তেজ ধারণ করিবে। বৃদ্ধের উৎসাহ দেখিয়া যুবারা উৎসাহী হইবে। স্বর্গীয় উৎসাহের কথা আর কি বলিব? স্বর্গের উৎসাহ বৃদ্ধকালে আরও অধিকতর তেজ লাভ করে। যত উপাসনা করিবে উপাসনা তত সতেজ এবং সরস হইবে। উপাসনাই উৎসাহের আকর। এই উপাসনা দ্বারা আমাদের আত্মা স্বর্গলোক, পরলোকের জন্য উপযুক্ত হউক।

দর্শন ও নিরীক্ষণ।

রবিবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৮৯৮ শক; ১১ই মার্চ্চ ১৮৭৭।

ব্রহ্ম পুষ্পের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ভক্তের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হন। যদিও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ তথাপি তিনি ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইয়া উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া সাধকের আত্মাতে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের মনের গুপ্ত ভাব সকল ক্রমে ক্রমে ভক্তের নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে। প্রথমে যে ঈশ্বরের অল্প প্রকাশ হয়, তাহার প্রতিই সাহস পূর্ব্বক দৃষ্টিকে স্থির রাখিতে হইবে। অনেকে অস্থির হইয়া ভীত হন। তাঁহারা বলেন, নিরাকারের প্রতি কিরূপে অধিক-ক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখিব? কিন্তু ধৈর্য্যশীল হইয়া নিরাকাররূপ একটী ক্ষুদ্র মূল ধরিয়া থাক, ক্রমে ক্রমে সেই মূল হইতে অনেক প্রকার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে। একটী গোলাপ ফুল যখন কেবল ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার সমুদয় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা অতীব সুন্দর হইয়া প্রস্ফুটিত হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম পুষ্প ক্রমে ক্রমে তাঁহার সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মাণ্ডের পতি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভক্ত হৃদয়ে প্রকাশিত হইব। ভক্তির পরিমাণ অনুসারে সাধকের হৃদয়ে ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা প্রভৃতি অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। যত মনুষ্যের প্রাণকে

অন্য বস্তু টানিয়া লয় তত তাহা চঞ্চল হয় এবং তত তাহা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। আর সাধক অন্য বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যত ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখেন, তত তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং তিনি ক্রমাগত ঈশ্বরের নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। বিষয়াসক্ত মন ঈশ্বরেতে সংলগ্ন হয় না। শুষ্ক অভক্ত চক্ষের নিকটে ব্রহ্ম অপ্রকাশিত থাকেন।

অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন, দৃষ্টি স্থির করার অর্থ ঈশ্বরকে ধারণ করা। নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বরকে ধারণ করা চঞ্চল মনের কার্য্য নহে। চক্ষু, আর কিছুই দেখিও না, কেবল এইখানে ব্রহ্ম আছেন তাঁহাকেই দেখ, চক্ষু যদি অভক্ত হয় সে বলিবে আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কোথায় ব্রহ্ম, কেবলই শূন্য দেখিতেছি। অভক্ত চক্ষুকে যদি আরও স্থির করিতে চেষ্টা কর, সে আরও ভয়ানক হৃদয়-বিদারক কথা বলিবে। সে বলিবে, আগে যেন নিকটে একটী হৃদয়বন্ধু আছেন বোধ হইত, এখন দেখিতেছি কেহই নাই। এই অবস্থায় মানুষের পক্ষে কি করা উচিত? সে বলিবে যখন দৃষ্টি স্থির করিলে কিছুই দেখিতে পাই না, তখন অত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল উদ্দেশে তাঁহাকে ডাকাই ভাল। খুব সূক্ষ্মরূপে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিলে যখন তিনি একেবারে দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হন, তখন ভিতরে বাহিরে সমুদ্রে পর্ব্বতে

ফলে ফুলে সর্ব্বত্র তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা না করিয়া দিনান্তে নিশান্তে এক আধ বার প্রাণের সহিত তাঁহাকে ডাকাই ভাল। এই যুক্তির মধ্যে যে কেবল অসত্য আছে তাহা নহে ইহার মধ্যে ঘোর বিপদ স্থিতি করিতেছে।

ফলতঃ শুষ্ক নয়নে যেখানে সেখানে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে আশা করিলে নাস্তিকতার হস্তে পড়িতে হয়। আগে দৃষ্টিকে প্রেমভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া লও, পরে সেই প্রেমার্দ্র চক্ষু যখনই ব্রহ্মের উপরে পড়িবে, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্ম-রূপসাগরে মগ্ন হইয়া যাইবে। ভক্তচক্ষু একেবারে ব্রহ্মের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া যায়। যখন এইরূপে দুয়ের যোগ হইবে তখন যতই ব্রহ্মদর্শন করিতে ঈচ্ছা কর ভয় নাই। কেন না তখন তোমার সরস ভক্ত নয়ন প্রেম রজ্জুদ্বারা ব্রহ্মকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। যখন ব্রহ্ম তোমার চক্ষুর সঙ্গে গ্রথিত হইলেন, তখন তোমার চক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মকে যাইতেই হইবে। তখন ব্রহ্ম তোমার নয়ন-অঞ্জন হইলেন। এই অবস্থার পূর্ব্বে ব্রহ্মকে নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, তখন কেবল দুই একবার পথের দেবতার ন্যায় ব্রহ্মকে দর্শন এবং নমস্কার করিয়া যাওয়াই ভাল।

প্রথমাবস্থায় নিরীক্ষণ করা বিপদের কারণ। প্রথমে হে ঈশ্বর, তুমি আছ, এই কথা বলা যায়, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি কেমন, এ প্রশ্ন করিয়া ঈশ্বরের রূপ নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা

করা বিপদের বিষয়। মধুকর যেমন প্রথমে অল্পে অল্পে পুষ্প-মধু পান করে, পরে ক্রমশঃ পুষ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুধা-পান করিয়া মত্ত হইয়া যায়, ভক্ত সাধকও সেইরূপ প্রথমাবস্থায় বারম্বার ঈশ্বরকে দর্শন করেন, কিন্তু উন্নত অবস্থায় ব্রহ্মকে নিরীক্ষণ না করিলে তাঁহার হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। যতক্ষণ না কোন বস্তু স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ তাহার গুপ্ত মনোহর ভাব গণনা করা যায় না। কোন একটী সুন্দর ছবি প্রথমে আমরা দর্শন করি, পরে নিরীক্ষণ করি, তাহার পরে সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করি। বন্ধুকে ঘরে পাইলে প্রথমে তাঁহার মুখ অবলোকন, পরে যতই প্রেমচক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করি. ততই চক্ষু বন্ধুর রূপরসে ডুবিয়া যায়। সেইরূপ, হে উন্নত ব্রহ্ম. যত ঈশ্বরেতে দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছ, ততই ঈশ্বরকে মনো-হর দেখিয়াছ কি না বল? আকাশের মধ্যে শুষ্ক নয়নে তাকাইলে কেবলই শূন্য, এবং ধূম দর্শন করিবে, আর যদি ভক্তিনয়নে দেখ ব্রহ্মকে নিকটে দেখিতে পাইবে, এবং দেখিবে সেই একজন ক্রমাগত নূতন নূতন বেশ ধরিতেছেন। নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। সেইরূপ দেখিতে দেখিতে ভক্তনয়ন অবশেষে একেবারে ব্রহ্মরূপসাগরে ডুবিয়া যাইবে। অতএব তখন নয়নকে ঈশ্বরের প্রতি স্থির করিবে যখন নয়ন সজল হইবে। তখন যত দেখ তত লাভ, তখন আর ভয় নাই। তখন নির্ভয়ে ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিবে, কারণ তখন নাস্তিকতা বিপদের আশঙ্কা চলিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মপ্রেম চির সরস।

রবিবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৭৯৯ শক ; ১লা জুলাই ১৮৭৭।

যদি পৌত্তলিক হইতে হয় তবে রাঙ্গা চরণ মানিতেই হইবে। দেবতার চরণ রাঙ্গা নয় যে বলে সে পৌত্তলিক নহে। যদি পুতুল পূজা করিতে হয়, তবে তাঁহার রাঙ্গা চরণ পূজা করিলে তৃপ্তি আছে। তাপিত প্রাণকে শীতল করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য, এই জন্য পৌত্তলিক স্বর্গীয় দেবতার চরণে রাঙ্গা বর্ণ দেয়। যদি অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম হইতে চাও তথাপি ঈশ্বরের নিরাকার শ্রীচরণকে সুধারসে অভিষিক্ত করিতে হইবে। যদি হৃদয়ে অনুভব শক্তি থাকে, তবে বলিবে দয়াল প্রভুর যে চরণে আমাদের মস্তক লুণ্ঠিত সেই চরণ শুষ্ক নহে, তাহা প্রেমে রাঙ্গা হইয়াছে।

প্রভুর চরণ যে শুষ্ক বলিল সে আর ব্রাহ্ম রহিল না। ভক্তি চক্ষে এমন চরণ দেখিব যাহা হইতে অবিরত কৃপা ও আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহারা ঐ চরণের রূপ, কান্তি, সৌন্দর্য্য ভাবিয়াছেন তাঁহারা পাগল হইয়াছেন। ভক্তেরা ঈশ্বরের প্রেমানুরঞ্জিত চরণের শোভা দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আর ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইতে পারেন না, এই জন্য ভক্তি শাস্ত্রে মুখের বর্ণনা নাই। সমস্ত দেশকে ডাকিয়া তাহার গলায় অমূল্য রত্নহার দিয়া যাইতে পারিব যদি নিরাকার চরণ বক্ষে ধারণ করিতে

পারি। "দাঁড়াও একবার বক্ষঃস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের জলে, লুটাইয়া পদতলে সফল করি জীবন;" যিনি এই সকল কথা বলিতে পারেন, তিনি জানেন ঈশ্বরের চরণ কেমন সুধাময়। "পিতা, পাপীর বক্ষে তোমার শীতল চরণ স্থাপিত কর," এই কথায় কত আরাম।

এই চরণ কথার কেমন মধুর প্রভাব। চরণ কথা কে বাহির করিল? ঐ চরণের ছায়া লাভ করিয়া যে শীতল হইয়াছে, ঐ চরণের আশ্রয়ে যে নির্ভয় হইয়াছে, ঐ চরণের সৌন্দর্য্যে যাহার প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছে, সে তাহার বুকে হাত দিয়া দেখিয়াছে তাহার বুকের মধ্যে একটী স্থানে ঐ চরণ-রূপ সহস্র ফুল ফুটিয়াছে। ব্রহ্মপদসংস্পর্শে বহুকালের দগ্ধ প্রাণ শীতল হইয়াছে। "ভক্ত পড়িয়াছেন দেবতার চরণতলে" এই কথাটী এত মনোহর যে এই কথাটী শুনিয়া কত লোক সর্ব্বস্ব ছাড়িল। তাহারা বলিল, আমরা এই এক কথা হইতে লক্ষ টাকা বাহির করিব।

যখন চরণ কথা শুনিয়া মনুষ্যের এত ভক্তি হইল, তখন ঈশ্বরের মুখশ্রী দেখিলে ভক্তের মন কত প্রমত্ত হইবে তাহা ভাবিতে পারা যায় না। 'ক' অক্ষর দর্শন করিতে না করিতেই প্রহ্লাদদিগের, শিশুদিগের এত আহ্লাদ হইল। কিন্তু এমন আহ্লাদের স্রোত এত শীঘ্র বন্ধ হইল কেন? পরিচিত অপরিচিত সমুদয় ভাই ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করি, এই 'ক' অক্ষর বাহির হইতে না হইতেই সুধাভোগ বন্ধ হয়

কেন? প্রথম অন্ন ব্যঞ্জন পাইতে না পাইতে তোমরা উঠিয়া যাও কেন? প্রেমের ভোজে বসিয়াছ প্রাণ ভরিয়া পুণ্য শান্তি ভোজন কর, যত পার মহোৎসবের আনন্দ আহার কর। মহোৎসব শেষ না হইতে উঠিয়া যাইও না। তোমাদের হাত ধরিয়া বলি, তোমরা এমন অসৎ দৃষ্টান্ত দেখাইও না। জননী অন্ন পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তোমরা উঠিয়া গেলে তাঁহার মনে আঘাত লাগিবে।

ঐ দেখ, তোমাদের সমক্ষে দুই শত পাঁচ শত লোক উঠিয়া গেল, সাবধান কেহ যেন উঠিয়া না যান। মার অনুরোধ রক্ষা কর। জগতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য জগজ্জননী নিজ হাতে করিয়া সুধা পরিবেশন করিতেছেন, তোমরা ইহার প্রতিবন্ধক হইও না। যদি বলিতে পারিতে, মা সন্তানদিগের দুঃখ দেখিয়া উপাসনারূপ যে সুধা বিলাইতেছেন, তাহাতে মিষ্টতা নাই, উপাসনা একটী শুষ্ক ব্যাপার, তাহা হইলে তোমাদিগকে এই অনুরোধ করিতাম না। যখন ঈশ্বরের চরণের কথা শুনিয়াই প্রকাণ্ড বীরেরা অবসন্ন হইয়া পড়িয়া যায়, তখন পিতার স্বর্গে আরও কত বড় বড় অস্ত্র আছে। ভিতরে থাকিয়া কে বলিতেছেন আরও একবার সময় হইবে। আর একবার স্নেহময়ী জননী আসিবেন।

এই কথা শুনিয়া অবধি মনে বড় আশা হইয়াছে! আবার এই দেশে পবিত্র উৎসাহানল জ্বলিয়া উঠিবে। ঈশ্বরের প্রেমেতে লোক মাতিবে। তোমাদের পদানত হইয়া

ভিক্ষা চহিতেছি, এই কথা অবিশ্বাস করিও না। সেনাপতি জয়পতাকা উড়াইবেন, অন্ধকার দেশে আবার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে। অধর্ম্মের রজনী অবসানে ধর্ম্মের সুপ্রভাত হইবে। শত্রুদল চূর্ণ প্রায়; সত্যের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য আগত-প্রায়। প্রেমিক ব্রাহ্মগণ, এই পৃথিবীতে প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। যে শব্দ উচ্চারণ করিলে প্রাণ মোহিত হইয়া যায় তাহা কি বস্তু কেহ কি বুঝাইয়া দিতে পার? ভাল-বাসিয়া মরিয়া যাইব। শত্রুকে ভালবাস, পৃথিবীকে ভাল-বাস। মনে আছে ত সে সকল মহাত্মাদের নাম যাঁহারা পৃথিবীর কল্যাণের নিমিত্ত আপনাদের প্রাণ দিয়া গিয়াছেন? তাঁহারা পৃথিবীকে সোণার মুকুট পরিধান করাইয়া আপনারা কাঁটার মুকুট পরিতেন, পৃথিবীর লোককে সাল পরাইয়া আপনারা ছেঁড়া কাঁথা পরিয়া গাছতলায় থাকিতেন। তাঁহারা রাস্তায় রাস্তায় দয়াল নাম গাইয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা সকলেই প্রেমের মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের নাম শুনিলেও আশা হয়।

এস আমরাও প্রেমের মানুষ হই। আমরা এখনও কেবল প্রেমের 'ক খ' শিখিতেছি। প্রেমের পূর্ণ প্রস্ফুটিত ভাব কবে হইবে জানি না; কিন্তু কেহই নিরাশ হইও না, স্বর্গের জননী স্বয়ং প্রেমান্ন পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, মা ভাণ্ডার হইতে প্রেম-সুধা লইয়া আসিলেন বলে। যখন সেই সুধা পান করিব,

তখন অপ্রেম অশান্তি একেবারে পলায়ন করিবে। ব্রাহ্মগণ, তোমরা সকলকে ভালবাস, স্বর্গের প্রেমে তোমরা সুখী হইবে এবং দেশ বেঁচে যাবে। মার পরিবেশন কেবল আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরের পূজা হয়েছে কি? এই প্রথম পূজা আরম্ভ হইয়াছে। এখনও ব্রহ্মপূজার প্রথম বর্ণও ভালরূপে প্রকাশ হয় নাই। ব্রহ্মপূজা করিয়া জগৎ উদ্ধার হইবে। একটী লোকও মরিবে না। সকলেই বাঁচিয়া যাইবে, প্রতি জনেই পৃথিবী হইতে অনন্ত কালের ধন লইয়া যাইবে।

প্রত্যাদিষ্ট।

রবিবার, ১লা পৌষ, ১৮০০ শক; ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৭৮।

যে সকল বস্তু এই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল বস্তুর সংসারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, এ সকলের মধ্যেও স্বর্গের কিছু কিছু দ্রব্য আছে। এই সংসারে স্বর্গীয় এবং পার্থিব বস্তু সকল মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা এই দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন, কোন্‌টী স্বর্গীয় এবং কোন্‌টী পৃথিবীর। লক্ষণ দেখিয়া চেনা যায় কোন্‌টী স্বর্গীয় এবং কোন্‌টী পার্থিব। পৃথিবীর বস্তু ত মলিন আছেই, কিন্তু আপাততঃ অনেক মলিন বস্তুর মধ্যেও স্বর্গীয় পদার্থ লুক্কায়িত থাকে। অনেক মানুষ আছে যাহারা মানুষ, আবার অনেক মানুষ

আছেন যাঁহাদের ভিতরের প্রকৃতি দেবতার প্রকৃতি। পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিমান আছে, যাহাদের বুদ্ধি, পৃথিবীর বুদ্ধি। আবার এখানে এমন লোকও আছেন, যাঁহাদিগের চক্ষু কর্ণ স্বর্গে উৎপন্ন, স্বর্গে গঠিত। চক্ষু কাহার না আছে? কিন্তু কে স্বর্গের শোভা দেখিতে পায়? কাণ কাহার না আছে, কিন্তু কয় জন লোকের কর্ণ স্বর্গের শব্দ শুনিতে পায়?

এই পৃথিবীতে স্বর্গের পুস্তক এবং মনুষ্যরচিত পুস্তকও রাশি রাশি আছে। আমাদের সম্বন্ধে স্বর্গীয় পার্থিব দুইই রহিয়াছে; কিন্তু এমন বিচক্ষণ চক্ষু কাহার, যে দুগ্ধ এবং জল পৃথক করিতে পারে? অথচ পার্থিব হইতে স্বর্গীয় বস্তু বাছিয়া লইতেই হইবে। পার্থিব পুস্তকের মধ্যে অনেক ভাল ভাল পুস্তক আছে বলিয়া সমুদয়কে মনুষ্যের রচিত মনে করা উচিত নহে। কোন্ পুস্তকে কাহার নাম অঙ্কিত আছে, তাহা দেখিতে হইবে। ধন রত্ন, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদয়ই পৃথিবীতে মিশ্রিত ভাবে স্থিত, কিন্তু তাহার মধ্যেও পার্থিব ও স্বর্গীয় বিভাগ আছে। মনুষ্যসম্বন্ধেও এইরূপ। ধাম্মিক সংসারী স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসেন। ঈশ্বরের ভাব, ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, ঈশ্বরের ক্ষমা, ঈশ্বরের উৎসাহ, মনুষ্যের আকার ধরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়; নিগূঢ়তত্ত্বদর্শীরা এ সকল দেখিয়া আমোদ করেন। এই সমক্ষে দেখ, টাকা কড়ী ধন রত্ন মনুষ্য কত কি আছে। যাঁহারা বিচক্ষণ ভক্ত তাঁহারা বলিলেন, এই ধন রত্ন ঈশ্বরের,

ঐ সম্পদ ঐশ্বর্য্য পৃথিবীর; এই পাঁচটী লোক স্বর্গের চিহ্নিত লোক, ঐ পাঁচ লক্ষ লোক পৃথিবীর লোক। অনেক জিনিস আছে যাহা পৃথিবীতে উপার্জ্জন করা যায় যেমন টাকা বিদ্যা; কিন্তু এমনও অনেক জিনিস আছে, যাহা কেবল ঈশ্বরেরই নিকট পাওয়া যায়; যেমন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। ইহা পৃথিবীর কোন স্থানে কিম্বা কোন মনুষ্যের নিকট পাওয়া যায় না।

মানুষ জন্মে কোথায়? মাতৃগর্ভে। কিন্তু যখনই স্বর্গীয় পুরুষের জন্ম হয়, তখনই ঈশ্বর তাঁহার রক্তের মধ্যে স্বর্গের ভাব দিয়া তাঁহাকে গঠন করেন। দশটী স্বর্গের কার্য্য সমাধা করিবার জন্য পৃথিবীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাকে দেখিয়া জননী কৃতার্থ হন এবং পৃথিবী ধন্য হয়। তিনি জন্মসন্ন্যাসী, প্রেরিত ঋষি, তিনি জগতের আদরের গোপাল, তিনি প্রেরিত শিশু, তাঁহাকে দেখিয়া পৃথিবী বলিল, আমাদের গুরু আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহার গুরুত্ব বুঝিল। তাঁহার জিহ্বাই বেদ, তাঁহার জীবনই শাস্ত্র, তিনি জন্মসাধক, তিনি জন্মযোগী। তাঁহার এক একটী কথা শুনিয়া লোকে বলিবে, ইহাঁর এক একটী কথা স্বর্গের অভ্রান্ত দেববাণী। এই এক শ্রেণীর লোকের কথা। ইহাঁদিগের সমস্ত জীবনই সত্যপূর্ণ। পৃথিবীতে ইহাঁদিগের সংখ্যা অতি অল্প।

ইহাঁদিগকে ছাড়িয়া পরে এমন এক শ্রেণীতে আসিলাম, যাঁহাদিগের জীবনে দুই আনা সত্য লাভ করা যায়। জন্মসাধুর

জীবনে ষোল আনা পূর্ণ সত্য লাভ করা যায়, এই শ্রেণীর লোকের নিকট দুই আনা প্রত্যাদেশ লাভ করা যায়। ব্রাহ্ম স্বর্গের কোন পদার্থ অবহেলা করিতে পারেন না। অতএব যাঁহাদিগের জীবনে কেবল দুই আনা সত্য, আমরা তাঁহা-দিগের জীবন হইতেও স্বর্গের ফুলগুলি তুলিয়া লইব। ব্রাহ্ম বাগানের মালী হইয়া জন্মিয়াছেন। তিনি কেবল নানা স্থান হইতে স্বর্গের ফুলগুলি তুলিয়া মালা গাঁথিবেন। কোন কোন বৃক্ষে দুই একটী ফুল ফুটিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্ম-মালী তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। বিচার করিবার তাঁহার অধি-কার নাই। অল্প হউক অধিক হউক, সকল বৃক্ষ হইতেই তাঁহাকে স্বর্গের ফুল তুলিয়া লইতে হইবে। অতি সামান্য লোকের জীবনেও যদি একটী স্বর্গের ফুল ফুটিয়া থাকে, আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ঘোর অন্ধকার মধ্যে একটী লোকের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের একটী অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। ব্রাহ্ম সেই তেজের নিকট আপনার মস্তক নত করিলেন।

একটী লোক তাহার সমস্ত জীবনে একটী স্বর্গের কথা বলিল, তাহাতেই সে ধন্য হইল। একটী সামান্য লোক ঈশ্বর প্রেরিত একজন সাধুকে বলিল,—"তুমি ঈশ্বরের পুত্র, তোমাকে দেখিয়া আমার পরিত্রাণ এবং স্বর্গরাজ্যের আশা হইল।" এই কথা স্বর্গের কথা। মনে কর, সেই ব্যক্তি তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে আর একটীও স্বর্গের কথা

বলে নাই; কিন্তু তথাপি তাহার এই একটী কথাকেই স্বর্গের অমূল্য রত্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর এক জন লোক দৈবাৎ তাহার শত্রুর প্রতি মধুর ব্যবহার করিল, হয় ত সে নিজেই বুঝিতে পারিল না কেন সে এরূপ অনুষ্ঠান করিল। সে বুঝিতে পারুক আর না পারুক, শত্রুর প্রতি তাহার এই প্রেম ব্যবহার স্বর্গের ব্যাপার। চারিদিকে পার্থিব ব্যাপার; কিন্তু এই দুইটী জিনিস স্বর্গের।

ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হইতে যাঁহারা নিয়োগপত্র লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর রাশি রাশি বস্তুর মধ্য হইতে স্বর্গের বস্তু বাছিয়া লইতে পারেন। তাঁহারা লক্ষণ দেখিয়া স্বর্গীয় পদার্থ চিনিতে পারেন। যাহারা প্রত্যাদেশ পায় না, তাহারা ঈশ্বর এবং মূল সত্যের গৌরব বুঝিতে পারে না। তাহারা অনেক সময় সত্যকে মিথ্যা মনে করে এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে। পৃথিবীতে যে শ্রেণীর লোক যিনি, তাঁহাকে সেই শ্রেণীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যাদেশের পরিমাণ অনুসারে মনুষ্যমণ্ডলীকে শ্রেণীবদ্ধ করা কল্পনার কার্য্য নহে, ইহাতে বিজ্ঞান আছে। যেমন ঈশ্বর আছেন সত্য, তেমনই ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, সত্য, উৎসাহ ইত্যাদি মনুষ্যের আত্মা এবং বাহ্য মধ্যে আসে ইহাও সত্য। আমরা অনেক বৎসর হইতে ইহার প্রমাণ পাইয়া আসিতেছি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ইহার সাক্ষ্য দান করিব, এবং আমরা

যতই বৃদ্ধ হইতে থাকিব, ততই আমাদের এই বিশ্বাস ঘনতর হইতে থাকিবে।

আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক আছেন, যাঁহা-দিগের হৃদয় মনের মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ণ; যাঁহাদিগের চরিত্র মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারি। এই কথা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিও না যে, ঈশ্বর কেবল আমাদের কয়েক জনের মধ্যেই অবতীর্ণ, আর সাধারণ লোকেরা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরকে বাস করিতেছে; তাহারা আর ঈশ্বরের কোন সত্য কিম্বা ভাব লাভ করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা, ইহা ঘৃণিত অনৃত বাক্য। যাঁহার ভিতরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বায়ু ঘুরিতেছে, তিনি যে সকল বিষয়েই প্রত্যাদিষ্ট হন, ইহা মিথ্যা কথা। যিনি এক মাসে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তিনি যে সকল মাসেই প্রত্যাদেশ পাইবেন, ইহা সত্য কথা নহে। অথবা যিনি এক বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি যে সকল বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন, ইহা মিথ্যা। যিনি ক্ষমা বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি হয় ত অন্য বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান না। সরল সাধকেরা কখনও মিথ্যা বলেন না। তাঁহারা কখন কি বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান এবং কখন কি বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান না, সকলই অকপট ভাবে স্বীকার করেন, আপনারাই বলেন।

যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট, লক্ষণ দেখিলেই তাঁহাদিগকে চেনা

যায়। যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়োগপত্র পাইয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের জ্যোতি জ্বলিতে থাকে। তাঁহারা আপনারাই বলেন, এই এই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। আদেশ পাইলেই কার্য্যভার লইতে হয়। তুমি মুখে বলিতেছ, প্রত্যাদেশ পাইয়াছ, অথচ তুমি যদি সেই আদিষ্ট কার্য্য না কর, তুমি প্রবঞ্চক। তুমি স্বীকার করিতেছ, মনুষ্যচরিত্র গঠন করিতে তুমি এই সংসারে আসিয়াছ। তোমার স্পর্শ মাত্র কঠোর মন বিগলিত হয়, পাপাসক্ত চিত্ত ঈশ্বরের দিকে পরিবর্ত্তিত হয় এবং অতি সহজে চরিত্র গঠিত হয়, যদি এইরূপ না হয়, তুমি প্রবঞ্চক। ঈশ্বর এক এক জনকে এক একটী বিশেষ কার্য্য ভার দিয়া এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন। প্রত্যেকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলেই তাহার নিজের এবং জগতের পরিত্রাণ হয়।

তুমি ক্ষমা দ্বারা তোমার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছ, আর কিছু করিতে পার আর না পার, তুমি জগতে কেবল ক্ষমার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাও, ইহাতেই জগৎ উদ্ধার হইবে। তুমি জন্ম উদাসীন, ফকীর হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছ, ঈশ্বর হইতে ফকিরী ভাব পাইয়াছ, তুমি জগৎকে কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও, তাহাতেই জগতের পরিত্রাণ হইবে, তোমার অন্য লক্ষণ দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

অতএব কার্য্যের জন্য অহঙ্কার এবং ঈর্ষা পোষণ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। তোমার পাঁচখানি কার্য্য আছে, আমার না হয় দুইখানি কাজ আছে, তাহাতে আমার দুঃখের বিষয় কি? এবং তোমারই বা গৌরবের বিষয় কি? ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বরের আদেশে যিনি গান বাঁধিতে আসিয়াছেন, তাঁহার বাদ্যে হস্ত দিবার প্রয়োজন কি? যিনি ক্ষমাচন্দ্র প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন, তিনি যেন বিনয় অথবা সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা না করেন। যিনি বিনয়ী হইতে আসিয়াছেন, তিনি যেন স্বর্গের আর কোন লক্ষণ দেখাইতে অহঙ্কার না করেন। অহঙ্কারশূন্য হইয়া আপন আপন নিয়োগপত্র দেখিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও। কেহই অনধিকার চেষ্টা করিও না। যিনি যে কার্য্যের জন্য প্রেরিত, তিনি যেন কেবল সেই কার্য্যই করেন, সেই কার্য্য-সম্পর্কে তাঁহার যতদূর আবশ্যক তিনি প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বর নিঃশ্বাস পাইবেন, এবং পৃথিবীও সেই বিষয়ে তাঁহার অনুকূল হইয়া প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য আনিয়া দিবে। অতএব কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর যাঁহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, তিনি যেন সেই স্থানেই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।

যিনি স্বর্গের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল লিখিতে জন্মিয়াছেন, তিনি

ক্রমাগত লিখিতে থাকুন; যিনি সঙ্গীত করিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত সঙ্গীতের উন্নতি করিতে থাকুন, তাঁহারা প্রতিজনেই আপন আপন কার্য্যে স্বর্গ হইতে সাহায্য লাভ করিবেন এবং পৃথিবীও তাঁহাদিগকে সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দিবে। যাঁহারা শিশু, যুবা অথবা নারী চরিত্র গঠন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন বিষয়ে স্বর্গ হইতে নূতন নূতন প্রত্যাদেশ লাভ করিবেন। যাঁহারা পাপী জগতের মধ্যে পুণ্য বিতরণ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে স্বর্গ হইতে রন্ধন করা পুণ্যের অন্ন সকল আসিবে। অতএব আচার্য্যগণ, প্রচারকগণ, তোমরা ঈশ্বরপ্রদত্ত আপন আপন হৃদয় এবং জীবনের উপযুক্ততা অনুসারে প্রতিজন কেবল তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কর, তাহা হইলে চারিদিকে কল্যাণের উৎস সকল উৎসারিত হইবে।

পূর্ণধর্ম্ম ভবিষ্যতে।

রবিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৮০১ শক; ২০শে এপ্রেল ১৮৭৯।

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম সূর্য্যের প্রখর কিরণ বিস্তার করিবে। এক দিকে রাখ ক্ষুদ্র বীজ, অপর দিকে রাখ সেই বীজ হইতে উৎপন্ন প্রকাণ্ড বৃক্ষ। এখনকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই বীজ, ভবিষ্যতের ফলপুষ্পে সুশোভিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ। এখনকার ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে কি দশ সহস্র বৎসর

পরে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে তাহার তুলনা হইতে পারে? এখনকার সত্য প্রস্ফুটিত সত্য নহে। পূর্ণ প্রস্ফুটিত সৌরভ ও লাবণ্যযুক্ত পুষ্প ভবিষ্যতে দেখিব। সেই পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিলে বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মকে ক্ষুদ্র মনে হইবে। প্রকাণ্ড জলপ্লাবনের ন্যায় যখন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিবে, যখন এই ধর্ম্ম সকলের ঘরে অমৃত আনিয়া উপস্থিত করিবে, তখনকার বিষয় ভাবিলেও মনে আনন্দ হয়। এখন যাহাকে আমরা ভক্তি বলি, তাহা কি ভক্তি? এখন যাহাকে আমরা যোগ বলি, তাহা কি যোগ? অবশ্যই ভূত কালের তুলনায় এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু ইহার সঙ্গে কি ভবিষ্যতের উন্নতির তুলনা হইতে পারে? যাহার মধ্যে পাঁচ সাতটী সত্য আছে তাহাকে কি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিব? এই জন্য ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি যে, এই বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

এই ধর্ম্ম পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতে এমন সকল গূঢ় সত্য উদ্ভাবন করিবে যে, তদ্দ্বারা প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রাণ বাহির করিয়া লইবে। ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মের পবিত্র নিঃশ্বাস বাহির করিয়া লইবে। এখন আমরা বঙ্গদেশে বদ্ধ হইয়া বসিয়া আছি; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। সকল ধর্ম্মের ভিতরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্কুর দেখিতেছি। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম অন্য অন্য নামে পরিচিত হইতেছে, সে সমস্ত ধর্ম্মে আমাদেরই ধর্ম্মের সত্য রহিয়াছে। সে

সকল ধর্ম্ম এক দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের আকার গ্রহণ করিবে, সকল ধর্ম্ম এক স্থানে আসিয়া একত্র হইবে। প্রত্যেক জাতি আপনার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদ্ভাবন করিবে। এক স্থানে সকল জাতি একত্র হইয়া দলবদ্ধ হইবে।

যতক্ষণ প্রাতঃকাল ততক্ষণ প্রাতঃকালের আদর; কিন্তু যখন সূর্য্য দ্বিপ্রহরের পূর্ণ আলোক বিস্তার করে তখন আর প্রাতঃকালের আদর কোথায়? ব্রাহ্মধর্ম্মের এখন প্রাতঃকাল। এখনও ব্রাহ্মদিগের ভক্তিপ্রধান ভক্তদিগের প্রগল্‌ভা অবস্থা লাভ হয় নাই, এখনও ব্রাহ্মগণ যোগশ্রেষ্ঠ যোগীদিগের প্রগাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই। এখনও ব্রাহ্মদিগের চরিত্র যথার্থ ব্রহ্মচারীদিগের নিকট নিকৃষ্ট। ভবিষ্যতের প্রকাণ্ড যোগীদিগের সঙ্গে কি এখনকার যোগীদিগের তুলনা হয়? এখনকার ভক্তদিগের দুই পাঁচ ফোঁটা অশ্রু কি ভবিষ্যতের ভক্তদিগের নিকট ভক্তি বলিয়া গণ্য হইবে? পৃথিবীতে ভবিষ্যতে যে সকল যোগী ভক্ত আসিবেন তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা দাঁড়াইতে পারিবেন না। ব্রাহ্ম, তুমি লজ্জিত হও। তুমি যদি বল ব্রাহ্মধর্ম্ম শেষ হইয়াছে, তবে তুমি যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা জান না। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা ভবিষ্যতে আসিবেন, ছোট ভ্রাতাদিগের পূর্ব্বে জন্ম হইয়াছে। বিপরীত কথা! কিন্তু ইহাই সত্য কথা।

শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মেরা ভবিষ্যতে আসিবেন। ক্রমে ক্রমে

শ্রেষ্ঠতম বৃদ্ধেরা আরও পরে আসিবেন। তোমাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি ভবিষ্যতে আসিতেছেন। তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, আমরা আগে চলিয়া যাইব, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদের মতে চলিবে। ইহা তোমাদের ভ্রম। ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মদিগের যোগেতে, ভক্তিতে, পবিত্রতাতে পৃথিবী টলমল করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আসল গূঢ় তত্ত্ব সকল এখনও আমাদের নিকট আসে নাই। ভূত কালের দিকে তাকাইব না। ভবিষ্যতের পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার মহিমান্বিত সিংহাসনে বসিয়া আছেন। যথা সময়ে ঈশ্বরের আদেশে তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন। আকাশে এমন সকল নক্ষত্র আছে যাহাদের জ্যোতি পৃথিবীতে এখন পর্য্যন্ত আসে নাই। সেই রূপ স্বর্গে এমন সকল সত্য গোপনে রহিয়াছে, পৃথিবী এখন পর্য্যন্ত যাহার আভাস পায় নাই। অতএব যোগের পথ, ভক্তির পথ, কর্ম্মের পথ শেষ হইয়াছে, কেহই এরূপ কথা বলিও না। ভবিষ্যতে মনুষ্যমণ্ডলী হইতে প্রকাণ্ড বৃহৎ ব্রতধারী যোগী সকল, ভক্ত সকল, কর্ম্মী সকল বাহির হইবেন। এক এক জন সত্যসাগরে মগ্ন হইয়া অমূল্য সত্যরত্ন সকল উদ্ভাবন করিবেন। কেহ যোগতত্ত্ব, কেহ ভক্তিতত্ত্ব, কেহ নীতিতত্ত্ব, কেহ সেবাতত্ত্ব ইত্যাদি মন্থন করিয়া নূতন নূতন সত্যামৃত উদ্ধার করিবেন।

এ সকল সাধনের জন্য তোমাদের মধ্যে কয় জন লোক আপন আপন জীবন উৎসর্গ কর। সকলেই ত ধন, মান,

সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতেছে। প্রচারকেরাও আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এমন সকল লোকের প্রয়োজন হইয়াছে যাঁহারা কি সংসার সাধন, কি প্রচার এই দুই পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা আবিষ্কার করিবেন। এইরূপে যদি দুই একজন লোক যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম আবিষ্কার করেন, তাহা হইলে পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম আগমন সম্বন্ধে সহস্র বৎসরের ব্যবধান হ্রাস হইবে। গৌণ হইবে না। এ কেবল সাধকদিগের দ্বারা হইতে পারে। কয়েক জন গভীররূপে রত্নাকরে প্রবেশ না করিলে রত্ন লাভ হইবে না। এস, আমরা সাধক হইয়া সে সকল রত্ন তুলিয়া লই। কতকগুলি লোক যোগ ভক্তি ও সচ্চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, জগতের অভাব। দিবা নিশি তোমরা সাধন কর, সাধনে তোমাদের জীবন শেষ হউক। যাঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য সাধন করিবেন, পৃথিবী তাঁহাদের পরিবারের ভার লইবে। এক এক সাধক বহুমূল্য রত্নের ন্যায় আদৃত হইবেন। সাধকেরা দেশে দেশে যাইবেন না; কিন্তু তাঁহাদের নিকট সকলে আসিবে। তাঁহারা ঘুরিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের চারিদিকে ধর্ম্মপিপাসু লোকেরা ঘুরিবে। তাঁহাদের জীবন ভাল হইবে, জগতের পরিত্রাণ হইবে। এই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বড় বড় যোগী, ভগবদ্ভক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। যতই এ সকল বিচিত্র প্রকৃতির ব্রাহ্মেরা

জন্মগ্রহণ করিবেন ততই ঈশ্বরের রাজ্য, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীকে শুদ্ধ করিবে; আমরাও শুদ্ধ এবং সুখী হইব।

ঈশ্বর প্রেরিত।

রবিবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৮০১ শক; ৬ই জুলাই ১৮৭৯।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কোন গুরুতর বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে, সেই বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কিছু অধিক বিশ্বাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আমি বলি ব্রাহ্মসমাজ দেবতার খেলা। উহা যে দেবতার খেলা তাহার প্রমাণ আছে। ব্রহ্মলীলার নাম ব্রাহ্মসমাজ। বর্ত্তমান কালে বর্ষে বর্ষে মাসে মাসে পক্ষে পক্ষে সপ্তাহে সপ্তাহে দিবসে দিবসে, আরও বলি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মরাজ্যে যে সমুদয় ঘটনা ঘটিতেছে, তৎসমুদয় ব্রহ্মলীলা। কেন না ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নিগুর্ণ নহেন, জগৎক্রিয়া ধর্ম্মজগতের বিশেষ ক্রিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মসমাজের লীলার মধ্যে মানুষ আছেন, যাঁহারা ব্রহ্মের পক্ষ। অবশ্য তাঁহারা অল্পসংখ্যক যাঁহারা ধর্ম্ম বিতরণ করিতেছেন, ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, গভীর উচ্চতর তত্ত্ব নিজ জীবনে সাধন করিতেছেন। এই সকল সাধক আচার্য্য বা প্রচারককে আমি বলি "ঈশ্বরপ্রেরিত"।

আমি "ঈশ্বরপ্রেরিত" বলি, নির্ভয় হইয়া বলি. বলিব মনে করিয়াই বলিতেছি। এই সকল লোক ঈশ্বরপ্রেরিত, ব্রাহ্ম-সমাজ এই ভাব গ্রহণ করিবেন, বরণ করিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এ কথা লইয়া বিবাদ হই-য়াছে, হয় ত চারিদিকে লোকেও বলিতেছে, আমরা উহা স্বীকার করি না। লোকে বলিতেছে, যাঁহাদিগকে প্রেরিত বলিতেছি তাঁহারাও বিরুদ্ধে বলিতেছেন। উভয় দিকেই মত বৈপরীত্য, বিবাদ বিসম্বাদ। যাঁহাদিগেরই হস্ত স্পর্শ করিয়া বলি তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত, তাঁহারাই অস্বীকার করেন, "আমি নই আমি নই" বলেন। যিনি আপনাকে অস্বীকার করেন, জগৎ তাঁহাকে কেন স্বীকার করিবে? তথাপি আমি স্বীকার করিব। সময়ে স্বীকার হয়, অসময়ে হয় না। ফল পরিপক্ক না হইলে কি তাহাকে ফল বলিতে পারা যায় না? তবে স্বীকার বিলম্বে কেন হইবে? যাঁহারা প্রেরিত তাঁহারা কেন আপনাদিগকে সমাদর করেন না? এ স্থলে সমাদর না করা পাপ ও অবিশ্বাস।

তোমরা বলিবে ইহাতে অবিনয় হয়। তবে অসত্য কি বিনয়? হস্তী যদি আপনাকে কীট বলে তাহা কি বিনয়? তাহা বিনয় নয়, কিন্তু অসত্য এবং কলঙ্ক। তোমরা বলিবে হউক, আমরা ইহাতে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইয়াও মনুষ্যসমাজে বিনয়ী বলিয়া সমাদৃত হইব। আমি তোমাদের এ চরিত্র ভাল বলি না। পরিত্রাণের সংবাদ তোমাদের

হাতে আসিল, মিথ্যাবাদী হইয়া তোমরা বলিলে কি না হাতে কিছু নাই। এ মিথ্যা কথায় কেবল তোমাদের নহে, ইহাতে তোমরা অন্যেরও সর্ব্বনাশ হইতে দেখিবে। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন হইতে সংস্থাপক ও তৎসঙ্গীগণ ব্রহ্মলীলাতে বিশেষরূপে সংযুক্ত। সাধারণ ভাবে সকলেই নিযুক্ত, কিন্তু সেই সাধারণ শ্রেণীর উপরে দেখিতে পাইবে বিশেষভাবে নিযুক্ত আছে, ব্রহ্মপ্রেরিত আছে। এই প্রেরিত এক জন নয়, দুই জন নয়, পাঁচ জন নয়, দশ জন নয়, অনেক। কত জন আমি বলিতে চাই না, সময় তাহা বলিবে।

ইঙ্গিতে জানিয়া বলিতেছি, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই ঘোর কলিযুগে প্রত্যাদেশ হয় না, অন্ধকারের ভিতরে আলোক দেখা যায় না, এ কথা থাকিবে না। জাগ্রৎ ঈশ্বরপ্রেম মনুষ্য মধ্যে বাস করিলে নিঃশ্বাসে তাহা জানা যায়। কার্য্য দর্শন করিলেই জানিতে পারা যায় ইঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত কি না? ঈশ্বর প্রেরণ করেন, ইহা বলিয়া কি হইল? ঈশ্বর কাহাকে প্রেরণ না করেন? কীট পতঙ্গ, চাষা, রাজা, কে না প্রেরিত? সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত সত্য, কিন্তু বিশেষরূপে প্রেরিত আছে। বর্ত্তমান বিধানে যাঁহারা বিশেষ সাধন করিবেন, তাঁহারা বিশেষ কীর্ত্তিস্বরূপ হইবেন। ঈশ্বরের জ্যোতির প্রদীপ সদৃশ ভারতের অন্ধকারের ভিতরে তাঁহারা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছেন, সূর্য্য না হন, চন্দ্র না হন, তারা না হন, অন্ততঃ এক একটী দীপ হইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ

পাইবেন। ইহাঁরা ঈশ্বরপ্রেরিত, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের অন্তর্গত।

এই যে তোমরা দুই শত পাঁচ শত লোক একত্র হইয়া আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছ, সত্যের জ্যোতির উপরে সকলের দৃষ্টি পড়ে ইহার উপায় করিতেছ, ইহা সামান্য ব্যাপার নহে। পুনরায় বলিতেছি, তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত। কেন না তোমরা সাধন করিতেছ, সংসারে সাধক হইয়াছ, অসার কার্য্য ধন, বিত্ত, নাচ, কামনা পরিত্যাগ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। কি কার্য্যে? জগতের কার্য্যে; সাধক বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য জীবন পবিত্র করিবার কার্য্যে; একজন হইতে দশ জন, দশ জন হইতে দশ সহস্র, দশ সহস্র হইতে দশ লক্ষ জন হইবে, এই কার্য্যে; অর্থ কামনা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের উৎসবে, ধ্যানে, সৎপ্রসঙ্গে, সচ্চিন্তায় আপন জীবন উন্নত করিবার কার্য্যে; পবিত্র স্থান, পুস্তক, নির্জ্জন চিন্তা হইতে জ্ঞানলাভ, পক্ষী, বৃক্ষলতা পল্লব, নদীস্রোত, নির্ম্মল শীতল বায়ু হইতে শুদ্ধি লাভ করিয়া, ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার কার্য্যে। যাঁহারা এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারাই সাধক। পাপ, অধর্ম্ম, ভীরুতা, এখন পর্য্যন্ত থাকিলেও তথাপি সাধক। অমুক নগর বা পল্লীতে অমুক লোক সংসারে ডুবিয়াছিল, সংসার হইতে একটু উঠিয়াছে, সেই বিপদের ঘোর সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধন করিতেছে, বাঁচিবার উপায় পাঠ

করিতেছে, ইহা ঈশ্বরের কীর্ত্তি, ঈশ্বরের লীলা। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের লীলা, আর সকলি ভ্রম।

অমুক স্থানে অমুক লোক ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সংসারে বদ্ধ ছিল, রাশি রাশি ধন পরিবর্জ্জন করিয়া, সংসার পরিত্যাগ করিয়া, মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; ঈশ্বরের হস্ত হইতে বিশেষ উপায়, বিশেষ সাধন লাভ করিতেছে। এ সকল ব্রহ্মলীলা। যে সকল লোকের দ্বারা এই ব্রহ্মলীলা সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহারা সামান্য নন। তাঁহারা ঈশ্বর লীলার সাক্ষী। ব্রহ্মলীলা যেখানে যেরূপ হইতেছে একত্রিত করিয়া ঈশ্বরপ্রেরিতগণকে গৌরব দিতে হইবে। সে সমুদয় লোক প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তাঁহারা বৃক্ষতলে বসিয়া সাধন করুন অথবা সংসারে বসিয়া ধর্ম্ম-সাধন করুন, যেখানে যে অবস্থাপন্ন কেন না হউন, ধনী হইয়া অট্টালিকায় থাকুন, বা দরিদ্র ভিখারী হইয়া বেড়ান, যিনি যে প্রকার অবস্থাপন্ন কেন হউন না, সকলেই ঈশ্বর-প্রেরিত, সমাদরের পাত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের জীবন দেখিয়া সাধক বলিব, সহায় বলিব, সামান্য বলিয়া মনে করিব না। যাহা তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন, জীবনে তাহা সত্য করিব, হৃদয়ে তাহা আলোচনা করিব। এই সকল লোককে ডাকিয়া বলিব, তোমরা সাধক ঈশ্বরের প্রেরিত। তাঁহারা স্বীকার না করিলেও সাধু বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিব।

কে ব্রহ্ম প্রেরিত? উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্ম কি কাহাকেও প্রেরণ করেন না? এক সময়ে তিনি করিতেন, এখন তিনি করেন না, যাহা কিছু হইতেছে নিয়মানুসারে হইতেছে, এ এ কথা বলিলে কি করা যায়? এ বিবাদ নিষ্পত্ত কঠিন। শীঘ্র যদি অন্যূন পঞ্চাশ জন অন্য সমুদয় কাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের আজ্ঞা প্রচার করেন, ব্রহ্মের দূত হইয়া আসিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞায় জগতের হিতসাধন করেন, সেই সকল লোককে অনাদর করিয়া কেন বলিব, তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত নহেন? তাঁহারা সত্যের সমাচার গোপন করিবেন কি প্রকারে? যদি কোন সত্য শিক্ষা দিতে, কোন বেদ-শাস্ত্রে দীক্ষিত করিতে আসিয়া থাকেন, তিনি বলুন না বলুন, আমি সেই লোককে প্রেরিত বলিব, নিশ্চয় বুঝিব তিনি সামান্য সাংসারিক লোক নহেন।

যিনি আমাদিগের মধ্যে অতি হীন, তিনিও যে ঈশ্বরপ্রেরিত ইহার প্রমাণ আছে। আমি একজন কল্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঈশ্বর যে যে বিষয় আমার দ্বারা সাধন করিয়া লইয়াছেন, সে সকল বিষয় আমা দ্বারা হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার অবহেলা থাকিতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট তদ্বিষয়ে আমার উপেক্ষা নাই। আমার মন দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত সেই বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়াছে। বলুন, সাক্ষাৎ দেবতা ঈশ্বর হইতে এ সকল হইয়াছে, ঈশ্বরের বক্ষ হইতে মেদিনীতে আমি আসি-

য়াছি, অন্যথা আমি আসিতাম না। যাহা করিতে আসিয়াছি যদি তাহা না করি জন্ম বিফল। ব্রাহ্মেরা ইহাই সুসিদ্ধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান। তাঁহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি হইবে। কতকগুলি লোক সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উন্নতি বিস্তৃত করিবেন।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের গন্ধ অল্প। এ ব্রাহ্মসমাজের আদর কি প্রকারে হইবে? হরিবিহীন ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজ হইবে কি প্রকারে? হরির হাত ধরিয়া উঠিবে, হরির হাত ধরিয়া বসিবে, হরির কথা ঘোষণা করিবে। হরির আদেশ স্বীকার করাতে নিন্দা অপমান কি? হরির কথা স্বীকার করিতে নিন্দা অপমানের ভয়, লজ্জার বিষয়। ঈশ্বর সৃজন করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, বঙ্গদেশে আদেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ব্রাহ্মসমাজ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করিবে। উপ-দেশ সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকেই উন্মত্ত করিতে হইবে, আদেশবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে, এ কথা বলিতে লজ্জা কি? বিশ বৎসর সাধন করিলে, এখনও বলিতে পার না সংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছে, জীবন্মুক্তি হইয়াছে, বড় লজ্জার বিষয়। দশটী পরিবারের ভার লইয়া আজও ব্রাহ্মপরিবার সংগঠনের চেষ্টা হইল না! যথার্থ কথা প্রচ্ছন্ন রাখিলে কি হইবে? লোকে খড়্গহস্ত হইবে বলিয়া কি সত্য বিলোপ করিতে হইবে? সত্য বলিতে লোকভয় কি? ভীরু হইয়া প্রবল সত্য সঙ্কোচ করিবে? সত্যপ্রকাশে লোকলজ্জার বিষয় কি?

ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন এ কথা বলিলে লোকে উচ্চ পদস্থ বলিবে এই তোমার বুদ্ধি? সত্য বলিলে অহঙ্কার প্রকাশ পাইবে, অসত্য বলিয়া বিনয়ী হইতে চাও? তুমি ব্রাহ্ম হইয়া নিজের বুদ্ধিমতে চলিতে চাও, ঈশ্বরের উপর কি তোমার সমুদয় ভার নহে? ঈশ্বর তোমাকে সত্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহারা নিকটে তোমরা প্রত্যেকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাঁহার নিকটে ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রতী হইয়াছ, এ সকল পরিষ্কার কথা কিরূপে অস্বীকার করিবে? তোমরা কি ব্রহ্মের সঙ্গে বাদ করিবে? তোমরা যাহাই কর ব্রহ্মমন্দিরের বেদী তোমাদিগকে স্বীকার করিবে। যাও অন্ধকার নিবারণ করিয়া জ্যোতি বিস্তার কর। যাও ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তোমরা যে প্রেরিত, প্রমাণ কর। মূর্খ বলিয়া ছল করিলে কি হইবে? যদি তোমরা হীনলোক বলিয়া স্বীকার কর, তথাপি ব্রহ্মমন্দিরের বেদী ঈশ্বরের প্রেরিত ভিন্ন আর কিছু বলিবে না। চন্দ্র সূর্য্য যদি বিলুপ্ত হয়, তথাপি তোমাদিগের এ পরিচয় জগতের নিকট থাকিবে। তোমরা সত্যের সাক্ষী, যতই তোমরা সত্যের সাক্ষ্য দান করিবে ততই তোমাদিগের দীপ্তি প্রকাশ পাইবে।

ব্রহ্মের প্রেরিত মানুষের সংখ্যা বৎসর বৎসর বাড়িবে। যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত তাঁহাদিগের এক কথায় সমুদয় অবিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যাইবে। তাঁহারা ব্রহ্মের নিকট কি কথা শুনিলেন, কি মূর্ত্তি দর্শন করিলেন, কি কি নূতন সত্য অঙ্গীকার করি-

লেন, কি কি নূতন রত্ন লাভ করিলেন, একবার জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে বেদ পুরাণ যেমন, ব্রহ্মপ্রেরিত লোকদিগের জীবন তেমান। হরির তত্ত্ব যাঁহারা শুনিতে পান তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। জীবনে যাঁহারা জাগ্রত সত্য দর্শন করিয়াছেন, ব্রহ্ম-লীলা যাঁহাদিগের জীবনে চলিতেছে, সেই সকল সাধককে ডাকিয়া এক স্থানে করিলে মহদ্ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে। সকল সাধক একত্র হইয়া হরিতত্ত্ব কথা বলিবেন, ইহা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। হরিনামের তত্ত্ব শুনিয়া তাঁহার যশোগান করিব, তাঁহার সুমধুর নামের পরিচয় দিব, তাঁহার নামে চমৎকৃত হইব, বিস্মিত হইব, হরিকথায় প্রমত্ত হইব, এ এক নূতন দৃশ্য। যাঁহারা যেখানে আছেন সকলে মিলিত হইয়া জীবনের কার্য্য আরম্ভ করুন, সকলে দলবদ্ধ হউন, তাঁহাদিগের মুখে হরিকথা শুনিয়া জীবন কৃতার্থ হউক।

ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণে প্রমাণ।

রবিবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৮০১ শক; ৩রা আগষ্ট ১৮৭৯।

ব্রাহ্মসমাজের ইহা অন্যায় যে একজন ব্যক্তির স্কন্ধে সমুদয় দায়িত্ব স্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের কথা সকলেরই বলা কর্ত্তব্য। যদি আমরা সকলে একত্র দল-বদ্ধ হইয়া চলিয়া থাকি তবে কেন তোমরা এক জন বা পাঁচ জনকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া সকলের বিশ্বাসকে অল্পসংখ্যকের

বিশ্বাস বলিয়া প্রতিবাদ কর। ইহা ভাল দেখায় না। সত্যের অনুরোধ হইতে মনুষ্যসমাজের অনুরোধ অধিক মনে করা ন্যায়সঙ্গত নহে। যখন সকলে একত্র যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি, এক মত, এক ঈশ্বর, এক বিশ্বাসে, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, তখন চলিতে চলিতে জন কয়েককে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, তোমরা তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতেছ; মিথ্যাবাদী, কুসংস্কারী, মূর্খ, অবিশ্বাসী, সাধনবিহীন বলিতেছ। পূর্ব্বের মত, বিশ্বাস, মন্ত্র, গুরু, দীক্ষা সকল অস্বীকার করিতেছ, পূর্ব্বে যাহাদিগের সহযাত্রী ছিলে তাহাদিগকে উপহাস করিতেছ, নিন্দা করিতেছ, ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। ব্রহ্মসঙ্গীত-পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তি, অনেক ভাব, অনেক সত্য রাহিয়াছে, তদ্ব্যতীত আর এক গুরুতর বিষয়ে উহা সাক্ষী আছে। কোন্ সময়ে কোন্ মত ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়াছে ব্রহ্মসঙ্গীত ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিকটে, বিশেষতঃ মনুষ্যের নিকটে সাক্ষ্য দিতেছে। ভাবী ইতিহাস লেখকের নিকট সঙ্গীতপুস্তক সাক্ষ্য দান করিবে, অমুক সময়ে অমুক মত প্রচালত ছিল। সমস্ত ভাবিষ্যদ্বংশীয়েরা বলিবে অমুক সময়ে অমুক ভাব, অমুক সময়ে যোগ, অমুক সময়ে বৈরাগ্যের ভাব প্রবল ছিল। এই ব্রহ্মসঙ্গীত ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মশ্রবণের কথা, যোগ ধ্যানের কথা, ব্রহ্ম সহ নিগূঢ়সম্বন্ধ স্থাপনের কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত এই সকল ব্যাপারে যাহা

প্রকাশ পাইতেছে. ব্রহ্মসঙ্গীত গুরু হইয়া সমস্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা ব্রহ্মের নিকটে যে মন্ত্র শিখিলাম তাহার প্রমাণ সঙ্গীত। সকলে উহা গান করিয়াছেন, ঈশ্বর সমক্ষে বন্ধুগণসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, এখন অস্বীকার করিলে সঙ্গীতপুস্তক দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। ব্রহ্মদর্শন কেহ অস্বীকার করিতে পার না, সঙ্গীতে উহা বদ্ধ হইয়াছে। হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব সঙ্গীত দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি ব্যক্তিবিশেষে এই মত বদ্ধ থাকিত, যদি কোন সাধক কোন ব্রাহ্মযোগীর নিকটে ঈশ্বরের পরিচয় হইত, তাহা হইলে সাধারণের মত বলিয়া বিচারিত হইত না। এই সকল গান যদি সাধারণের হয় ইহা কেবল নির্জ্জনে বদ্ধ থাকিতে পারে না, ব্যক্তি বিশেষের হইতে পারে না। শত শত লোক উচ্চারণ করিয়া জগতের সমক্ষে ক্রমাগত এই মত প্রকাশ করিয়াছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকেরা এই সকল পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের নিকটে এ সকল সহজ কথা নহে। তাঁহারা যখন দেখিবেন, বড় বড় যোগী নহে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মগণ নিরাকার ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন লিপিবদ্ধ আছে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ব্রাহ্মসমাজ ঋষি যোগী ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগধর্ম্ম ঋষিধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। তোমাদিগকেও এখন এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরের কথা শুনা যায়, কেবল

তোমরা মুখে বল নাই, গান দ্বারা এ মত স্বীকার করিয়াছ। এখন যদি এই কথা বল ইহা অধিকাংশের মত নহে, দু পাঁচজনের মত; অধিকাংশের পুস্তকে যে মত, তাহা খণ্ডন করিবে কি প্রকারে? এখন কি আর অল্প বিশ্বাসীগণের মধ্যে গণিত হইতে চাও। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, এখন বলিতেছ, ভবিষ্যতেও বলিবে এই প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। এক সময়ে ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, কঠোর হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, এখন যদি না হয়, তবে অবিশ্বাসের পথে গিয়াছ বলিতে হইবে। ঈশ্বর কথা কন, দিবারাত্র তাঁহার কথা শুনিতেছ, ইহা যদি বলিতে পার, তবে বলি বিশ্বাসের রাজ্য সুদৃঢ় হইতেছে। ঈশ্বর দেখা দেন, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করা যায় স্বীকার করিয়াছ, সঙ্গীত উহার সাক্ষ্য দিতেছে। এখন যদি বল তিনি কেবল যোগীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তিনি কি সকলের নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, মানুষের ন্যায় কথোপকথন করেন, তবে তাহা মানিব না। পূর্ব্বে এ সকল স্বীকার করিয়াছ ব্রহ্মসঙ্গীত পৃথিবীর নিকট বলিবে। এখন এরূপ বলিলে নাস্তিক বলিয়া খ্যাতি হইবে। একবার যাহা বলিয়াছ সত্যের অনুরোধে তাহা অস্বীকার করিতে পার না। যদি বীজ মন্ত্রের প্রতিবাদ কর তবে যে অবিশ্বাসী হইলে যদি পূর্ব্বের কথা সকল অস্বীকার কর, ব্রহ্মসঙ্গীত মিথ্যা বলিয়া উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেল, ব্রহ্মবীজমন্ত্র গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দাও। একবার সত্য স্বীকার করিয়া তাহা অস্বীকার

করিতে পার না। যাহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহা উৎপাটন করিলে আপনি উৎসন্ন হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ যাহা এত দিন মানিত, তাহা কি এখন অল্প কয়েক ব্যক্তিতে বদ্ধ হইবে? কেহ কেহ যোগ করেন, অধিক হয় ত পঞ্চাশ জন হইবে, তাঁহারাই কি এখন দর্শন শ্রবণের কথা বলিবেন? ব্রহ্মযোগী স্বতন্ত্র বিধি, স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মদর্শন করেন, অল্লাধিক ব্রহ্মকে বুঝিতে পারেন, নিজ নিজ জীবনে ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করেন, যদি এই রূপ হইল তবে এত দিনে উন্নতি কি হইল? এখন আন্দোলনে পড়িয়া, বিপাকে পড়িয়া কি সকলে বলিবেন, এ মতে দুই পাঁচ জন বিশ্বাস করে। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের পক্ষে ইহা সাজে না। পরীক্ষার সময়ে দুই একটী প্রহার বা নিন্দায় বলিবে, কে আমরা বলি নাই নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না তাঁহার কথা শুনা যায়, আমরা এ কথা শুনিয়া কর্ণে হাত দিয়া থাকি। কয়েক জন অহঙ্কারী হইয়া নিরাকার ঈশ্বরকে স্পর্শ করে, দেখে ও শুনে। দর্শন, আদেশ শ্রবণ ইহাতে আমাদের হস্ত নিলিপ্ত, ও মন্ত্র তন্ত্রে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কখন আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই। মনে হইতেছে এই বলিয়া অধিকাংশ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সত্যকে ফেলিয়া দিয়া সরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহার আশু প্রতিফল অবিশ্বাস নাস্তিকতা। নিরাকারের বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিলে আর কি থাকিল? যে

মত ব্রাহ্মধর্ম্মের ভূষণ তাহাই পরিত্যাগ করিতে চলিলে। ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা শিরোভূষণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা নিজস্ব ধন তাহা পরিহার করিলে আর আর মত লইয়া কি হইবে? আর আর মত কি অন্যান্য ধর্ম্মে নাই? যোগের শাস্ত্রও অন্যত্র আছে। কিন্তু নিরাকার পুরুষকে অন্তরের সহিত ভালবাসা কোথাও নাই। আর সব প্রাচীন বলিতে পারা যায়, কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করা, ভালবাসা, তাঁহার কথা শ্রবণ করা, তাঁহাকে দেখা আর কোথাও নাই।

তোমরা জগতের নিকট নিরাকার ঈশ্বর দর্শন, তাঁহার কথা শ্রবণ, তাঁহাকে অনুরাগ করার কথা বলিবে, পৃথিবীকে এই শুভ সংবাদ দিবে, ইহার মর্য্যাদা পরে লোকে বুঝিয়া সাধুবাদ প্রদান করিবে, ধন্যবাদ দিবে। ব্রাহ্মগণ যে অমৃত রাখিয়া যাইবেন, উহা দশ শতাব্দী পরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। যেমন সাকারকে দেখা যায়, তেমনি নিরাকারকে হৃদয়ে ধারণ, তাঁহার নিরাকার মুখ হইতে কথা শ্রবণ, ইহাতে একান্ত সুখী হইবে। এ কিছু সামান্য কথা নয়। তোমরা যে সত্য উদ্ভাবন করিলে তোমাদের নিকট তাহার আদর যদি না হয়, অন্য দেশের নিকট তাহা সমাদৃত হইবে। তোমরা যে গান করিয়াছ সে গান শেষ হইল, কিন্তু সেই সুন্দর সঙ্গীত পৃথিবীতে পুস্তকে নিবদ্ধ থাকিল, তোমাদের এই হৃদয়ের গান ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আদর করিবে; পৃথিবীর ধর্ম্মপথে অনুসন্ধান

করিয়া এই ফুলের মালা লাভ করিবে; তাহারা এই মালা গলায় পরিয়া সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের পূজা করিবে।

আমার আজ বেদী হইতে এই বক্তব্য যে, তোমাদের দেওয়া সত্য শত সহস্র বৎসর পরে কেমন আদৃত হইবে। এই মন্দির যেখানে এই সত্য তোমরা প্রকাশ করিয়াছ, যদি সে সময়ে তোমরা আসিতে পারিতে, দেখিতে কত লোক তাহার কিরূপ আদর করিতেছে। তাহাদের চক্ষু হইতে কেমন প্রেমের ধারা পড়িতেছে, নিরাকারকে দেখিয়া কেমন প্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছে। সকল মনুষ্য সহজে তখন তাঁহার নিরাকার প্রেমমুখ দর্শন করিতেছে। কোন যুক্তি তর্ক নাই, সমস্ত পৃথিবী এই সত্য সহজে সাধন করিতেছে। আজ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কি করিবে বলা হইল, কিন্তু আমরা যে সত্য লাভ করিলাম আমরা নিজে কেন তাহা হইতে বঞ্চিত হই। সকলে মিলিয়া সরল ভাবে যে সঙ্গীত করিয়াছি, এখন সেই সঙ্গীত অনুসারে কেন বলিব না, নিরাকারের তন্ত্র মন্ত্র দুজনের মত নয়, ইহা সকলের মত। জগতের উৎপীড়নের ভয়ে নিরাকার দর্শন শ্রবণের মত মিথ্যা এ কথা যেন মুখ হইতে বাহির না হয়।

ব্রাহ্মসমাজ ইহার সাক্ষী আছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা শুনা যায়। যাহা মানিয়াছ তাহা স্থাপন করিতে হইবে। মিথ্যা কথা কখন বলিতে পার না, ইহা যে আমাদিগের প্রাচীন তন্ত্র। এ জন্য দশ জন কেন রক্ত দিবে, আমরা

সকলে মিলিয়া ইহার জন্য রক্ত দিব। পাঁচ জন এ জন্য উৎপীড়ন সহ্য করিবে, আর তোমরা উপহাস করিবে, উৎপীড়ন করিবে, সংসারের সহায়তা করিবে, ইহা কখন ন্যায়সঙ্গত নহে। যখন দর্শন শ্রবণের সঙ্গীত মুখে আনিয়াছ তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হও। নিরাকারকে দেখা যায় না, তাঁহার কথা শুনা যায় না, পৃথিবীর এই অবিশ্বাসের কথার প্রতিবাদ কর। সেই গান মনে কর, সেই সঙ্গীত করিতে থাক, প্রাচীন ভাব পুনরুদ্দীপন কর, তখন দেখিবে নিরাকারে জ্বলন্ত বিশ্বাসে কিরূপ সুখী হও।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মমন্দির হইতে দর্শন শ্রবণ বিষয়ে উচ্চ উচ্চ কথা অনেক সময়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দক্ষিণে বামে রাখিয়া মধুর সঙ্গীত করা হইয়াছে। সেই সকল কথা অমৃত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার রূপ দর্শন চক্ষের ভূষণ; তাঁহার কথা শ্রবণ কর্ণের ভূষণ হইয়াছে। ইহা কত দূর হইয়াছে জীবন ও চরিত্র প্রকাশ করিবে। নিরাকার ঈশ্বর কেমন সুখপ্রদ ইহা শিখাইবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে প্রত্যেক উপাসককে অনুরোধ করিতেছি। তোমাদিগের প্রতি জনের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব রহিয়াছে। যাঁহারা এই সকল সঙ্গীতে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এ বিষয়ে দায়ী। পৃথিবীকে দেখাইতে হইবে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস গ্রহণ করিলে জীবন কিরূপ হয়।

পৃথিবী বলিবে তোমরা নিরাকার বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিয়াছ তাহার উৎকৃষ্ট ফল দেখিতে চাই। কে বলিতে পারে যে এরূপ হইবে না, দশ বৎসরের পরে এই রাজপথ দিয়া যাহারা চলিবে, তাহারা আমাদিগকে বলিবে তোমরা নিরাকারের কথা কও শুনিব। যদি তোমরা তাহাদের কথার উত্তর না দাও তোমাদিগকে অবিশ্বাস করিবে, অশ্রদ্ধা করিবে। তাঁহার রূপের মধুরতার কথা গান করিলে, বল তাঁহার রূপ কেমন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর কি? চক্ষু যাহাকে দেখে নাই, কর্ণ যাঁহার কথা শুনে নাই, তোমরা তাঁহাকে দেখিয়াছ শুনিয়াছ, সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে। হাঁ, আমরা দেখিয়াছি, আমরা তাঁহার কথা শুনিয়াছি, সহজ ভাবে তাঁহাকে দেখা যায়, সহজ ভাবে তাঁহার কথা শুনা যায়, ইহা তোমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইবে। বিশ্বাসের রাজ্য বিস্তার করিয়া সাকার ঈশ্বর অনাবশ্যক জগদ্বাসীর নিকট সপ্রমাণ করিতে হইবে। নিরাকারকে দেখ, স্পর্শ কর, তাঁহার কথা শ্রবণ কর। সকলে উদ্যোগী হও, তোমাদিগকে এ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যথোচিত পুরস্কৃত হইবে।

ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক।

রবিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৮০১ শক; ১৮ই আগষ্ট ১৮৭৯।

রোগ প্রতীকারের জন্য চিকিৎসা করা, ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। এক রোগীর সেবা করিবার জন্য কত নিগূঢ় বিষয় জানিতে হয়, কত উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, কত পরিশ্রম ও পুস্তক পাঠ করিতে হয়। এত পরিশ্রম, এত যত্ন, এত বিদ্যা বুদ্ধি এ সকলের শেষ ফল কি হইল,—রোগের প্রতীকার, রোগীর আরোগ্য। আরোগ্য শব্দের অর্থ কি? রোগ হইতে মুক্তি। রোগ হইতে মুক্তি আরোগ্য, ইহার সহজ ভাষা, শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন; যে বিকৃতি হইয়াছিল তাহা ঘুচাইয়া প্রকৃতিকে পুনঃপ্রকাশ। আরোগ্যে অস্বাভাবিক স্বাভাবিক হইল। এত যত্ন পরিশ্রমের ফল হইল শরীরের স্বভাব। শরীরের যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহাই হইল। এ দিকে আত্মা সম্বন্ধেও অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকা পাপ, মোহ, অবিশ্বাস, আসক্তি; স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা উন্নতি, ধর্ম্ম, শান্তি। চিত্তাবিকারের নাম নরক, প্রকৃতিতে অবস্থিতির নাম স্বর্গ। ধর্ম্মসাধন প্রণালীর অর্থ কি, অভিপ্রায় কি? বিকৃত মনকে প্রকৃতিস্থ করা। পৃথিবীর যত লোক অস্বাভাবিক বিকারের পথে ভ্রমণ করিতেছে, প্রকৃতি ঘুচাইয়া বিকৃতি আনয়ন করিতেছে, বিকারের ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে, উপাসনা যোগ ধ্যান সাধুসঙ্গ

প্রভৃতি তাহাদিগকে সেই বিকৃতি হইতে প্রকৃতির পথে আনয়ন করিবার জন্য।

ধর্ম্মের দ্বারা কি হয়? মনুষ্যেরা সত্যের পথে ঈশ্বরের পথে আগমন করে। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমরা স্বাভাবিক হইতে চেষ্টা করি। এখানে কঠোর ভাষা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই, সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম স্বাভাবিক না হইলে রোগ। ধর্ম্ম স্বাভাবিক হইলে মনুষ্যের কর্ত্তব্য সহজ হইল। ঈশ্বর-দর্শন শক্ত, আদেশ শ্রবণ শক্ত লোকে মনে করে, ফলে শক্ত নহে। দর্শন শ্রবণ স্বাভাবিক। কাণা ও বধির দেখিতে শুনিতে পায় না, কিন্তু তদ্ভিন্ন কে দর্শন শ্রবণ করিতে চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে? শিশু যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, সহজে দেখে সহজে শুনে। দেখা শুনা ভয়ানক ব্যাপার নহে। বল, কে দেখা শুনা সহজে সম্পন্ন করিতে পারে না? শরীর এমনি গঠিত, মনুষ্য চক্ষু খোলে আর অমনি দেখিতে পায়। অন্ধ হইলে লোকে দয়া করে, চক্ষু আছে বলিয়া কেহ প্রশংসা করে না। দর্শন জন্য গৌরব দেয় কে? চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য দেখে তাহাতে তাহার পুরস্কার কি, গৌরব কি? চক্ষুর যেমন সেখানে গৌরব নাই, তেমনি শব্দ শুনিতেও কর্ণের গৌরব নাই। কর্ণের শব্দ শ্রবণ প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা স্বাভাবিক সহজ, কে তাহাতে গৌরব দিতে চায়? শরীর সম্বন্ধে দর্শন শ্রবণ যেমন সহজ,

আত্মাসম্বন্ধে তদ্রূপ হওয়া উচিত। শারীরিক চক্ষু যদি দেখিতে না পায়, যাহাতে দেখিতে পাই তজ্জন্য চিকিৎসকের শরণাগত হই। চিকিৎসা প্রণালী আর কিছু নহে চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করা। অনেক ঔষধ অনেক পরিশ্রম, শেষে এই ফল হয় যে রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন। বিকার ঘুচিয়া গেলে চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরায় দেখিতে পায়। আত্মা ব্রহ্ম দর্শন করিবে তাহাতে কঠোর উপায় অবলম্বন শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতি কি প্রয়োজন? আর কিছুর প্রয়োজন নাই কেবল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা চাই। আত্মাকে স্বাভাবিক পথে আন, দেখিবে সকলি সিদ্ধ হইবে। চেষ্টা কর, আয়োজন কর, অধ্যবসায় নিয়োগ কর, সাধন কর, কিন্তু এ সকল স্বাভাবিক প্রণালীতে নিযুক্ত কর।

হে ব্রাহ্ম কল্পিত পথে যাইও না। স্বাভাবিক সহজ প্রণালী অবলম্বন কর, চক্ষু খুলিবে আর তৎক্ষণাৎ দেখিবে। নিমেষ মধ্যে ব্রহ্মদর্শন না হইল ত হইল না। হৃদয় বিকার-গ্রস্ত, যদি ব্রহ্মের গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিতে না পাও, নূতন-বিধ শাস্ত্র বুঝিতে না পার, সহস্র উপদেশ শুনিয়া তোমার কি হইবে, তোমার শ্রবণশক্তি এখনও প্রকৃতিস্থ হয় নাই। তোমার কর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলে কত উপদেশ শুনিতে পাইবে। ঈশ্বরের বাণী নিয়ত আসিতেছে, নিয়ত তিনি আদেশ করিতে-ছেন, প্রাতঃকাল সায়ংকাল গভীর নিশীথ কোন সময়ে তিনি কি বলিবেন কে জানে? যাহাতে পরব্রহ্মের আদেশ ও

উপদেশ সহজে বুঝিতে পার তজ্জন্য প্রস্তুত হও। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমাদিগের ধর্ম্ম অস্বাভাবিক হইতে পারে না। যে পথ অস্বাভাবিক, ব্রাহ্ম কখন সে পথে যান না। শরীর যদি শীতল বায়ু চায়, তাহা স্বাভাবিক প্রণালীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রেমের শীতল বায়ু লাভ করাও আত্মার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। সমুদয় অভাবগুলির পূরণ স্বাভাবিক প্রণালীতে হইবে, ইহাতে বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। প্রকৃত ধর্ম্ম আড়ম্বর শূন্য। ইহার সাধন সহজ, যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলই সহজ। বহু কষ্টে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয় না।

আমাদিগের মধ্যে এখনও ধর্ম্ম ঔষধসেবনের ন্যায় হইয়া আছে। ফলতঃ এখনও আমাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। কঠিন উপধর্ম্ম এখনও রহিয়া গিয়াছে, যে বস্তু আমরা চাই এখনও তাহা প্রাপ্ত হই নাই। যথার্থ বস্তু না হইলে ধর্ম্মসাধন কঠিন থাকিবেই। নিরবলম্ব উপায়ে ধ্যান করিতে হইবে। এখনও ধ্যান অত্যন্ত কঠোর হইয়া আছে। এরূপে কখন ধ্যান অভ্যাস হইবে না, ধ্যান করিতে গিয়া সংসারের চিন্তা দূর করিতে পারিবে না। যথাথ ধ্যান করিতে অনেক সময় লাগে, ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান বহু আয়াসসাধ্য, সহজে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায় না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ করিয়া যোগ করিতে হয়, যথার্থ ব্রহ্মযোগী এরূপ কখন বলেন না। যথার্থ যোগী যখন যোগ সাধন করিতে থাকেন, তখন তিনি পৃথিবী হইতে দশ হাত উর্দ্ধে

উঠেন। মন্দিরে আমরা একত্র হইয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলি কিন্তু এক "সত্যং" উচ্চারণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যোগীর আত্মা এক শত ক্রোশ উপরে চলিয়া যায়।

তুমি যদি বল বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় সাধন করিতে হয়, তবে যোগে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারা যায়, এ কথা ঠিক নয়। এ কথা অন্যান্য ধর্ম্মে সাজে। বহু আড়ম্বর, বহু উপায়, বহু সাধন, বিবিধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ফল কেবল কষ্ট। ব্রহ্মকে এরূপে লাভ করা যায় না, সুতরাং এরূপ পথ অবলম্বন অসঙ্গত। জলে নামিলেই যেমন তাহাতে মগ্ন হওয়া যায়, পক্ষী যেমন অনায়াসে উপরে উঠে, আত্মার ব্রহ্মে নিমগ্ন হওয়া, মানসপক্ষীর ঊর্দ্ধে উঠা তেমনি সহজ। উড়িতে ডুবিতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। স্বভাবের ধর্ম্ম স্বীকার করিলে, অনায়াসে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে কিছু অস্বাভাবিক নাই। যোগ ব্রহ্মদর্শন সহজ, অন্যথা দুবৎসর চিন্তা করিয়াও কেহ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে না।

কঠোর চেষ্টাতে স্বভাবকে ছাড়িয়া যাওয়া হয়। কষ্টে সাধন, প্রকৃতির ফল নয়। সে ফল প্রকৃত ফল নয়, সে প্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী নয়। অন্য ধর্ম্মে এ সকল অস্বাভাবিক প্রণালী অনুসরণ শোভা পায়, কিন্তু এই মন্দিরে যাঁহারা উপাসক, তাঁহাদিগের নিকট দর্শন, বস্তুস্পর্শ, প্রার্থনা এবং তাহার সদুত্তর শ্রবণ যদি সঙ্গে সঙ্গে না হয়, তবে সংশয় হয় এ সকল প্রকৃত নহে কল্পনা, কেবল টানিয়া মন হইতে

বাহির করা। প্রকৃতিস্থ থাকিলে তৎক্ষণাৎ ফল লাভ হয়। সর্ব্বদা সাবধান হও, অস্বাভাবিক বস্তুর জন্য কখনও প্রয়াস করিও না। স্বভাবতঃ ব্রহ্মকে দর্শন কর, সমুদয় বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া সহজ পথে আসিতেছ কি না দেখ। শরীরকে প্রকৃতিস্থ কর মনের পাপ, কুসংস্কার, মিথ্যা চিন্তা দ্বারা মন চঞ্চল না হয় এ জন্য স্বভাব দ্বারা পাপকে জয় কর, দেখিবে অতি সহজে যোগী হইবে। এক মিনিট বসিয়া দেখ দর্শন হয় কি না? এক মিনিটে দর্শন হইল ত হইল, নতুবা দুই পাঁচ বৎসর চেষ্টা করিয়াও বিকার না ঘুচিলে কিছু হইবে না। স্বভাবতঃ অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারা যায় অঙ্গ প্রকৃতিস্থ কি না? হৃদয় প্রকৃতিস্থ কি না, স্বভাবের নিকটে তাহার মীমাংসা।

অনেক চিন্তা অনেক ক্রন্দন ইহাতে কিছু হয় না। যদি অর্দ্ধ ঘণ্টা সরল প্রার্থনা হয়, চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ হইল, ফল তৎক্ষণাৎ হইবে। ব্রহ্মদর্শন যখন হয়, তখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হয়, অন্যথা অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বর আছেন, এই বক্ষে আছেন, প্রেরিত মহাজনগণকে রক্তের ভিতরে দেখিতেছি, এরূপ সহজাবস্থা ভিন্ন সুখ হয় না। বহু আয়াস চেষ্টাতে শান্তি হয় না। প্রকৃত ব্রাহ্ম আড়ম্বরশূন্য। স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে থাক, যাহা কঠোর তাহার অন্বেষণ করিও না। পিতার প্রতি সন্তানের, সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা সহজ, অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া আর তাহা আয়ত্ত করিতে হয়

না। কর্ণ পাতিয়া শুন ঈশ্বর কি বলিতেছেন। এ কথায় যে ব্যক্তি সন্দেহ করিয়া অস্বীকার করিল, তাহার কর্ণ আছে কে বলিতে পারে? যদি কর্ণ থাকে, যেমন শুনিবে অমনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে। চক্ষুকে স্বাভাবিক কর, দেখিবে কেমন তাঁহাকে বাহ্য বস্তুর ন্যায় দেখা যায়।

ব্রাহ্মের চক্ষু আছে কর্ণ আছে, অথচ সে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, তাহার সমুদয় বৃত্তি স্বাভাবিক আছে অথচ ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে পারে না, ইহা হইতে পারে না। তাহার সমুদয় বৃত্তি বিকৃত হইয়াছে, চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু বিকৃত প্রণালীতে চিকিৎসা করিও না। প্রকৃতিস্থ করিতে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিয়া থাক। এমন দিন হইবে, যে দিন জল পান করার ন্যায় ভাত খাওয়ার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান সহজ হইবে। কখনও সহজ ভাব ছাড়িব না। যদি সহজে শুনিতে না পাই, চিকিৎসার অধীন হইব, কিন্তু যোগ ধ্যান কঠিন বলিব না। ত্রিশ বৎসর কঠোর সাধন করিয়া ধ্যান করিবে ইহা কঠিন, ইহাকে বিফল যোগ বলি। প্রকৃত ধ্যান তাহাকে বলি, যাই চক্ষু বন্ধ অমনি প্রাণ ঊর্দ্ধে উড়িয়া গেল। যদি তোমাকে কতক্ষণ চেষ্টা করিতে হয়, সংসারে চলিয়া যাও, তোমার ধ্যান হইল না। চেষ্টা কি জানি না। জলে নামিলাম আর ডুবিলাম। চেষ্টা করিব, যোগ করিব, প্রেম সঞ্চয় করিব, ইহা হয় না। চেষ্টা করা পাপ, কঠোর

যোগসাধন অপরাধ। সেই ব্রাহ্ম মূর্খ যে চেষ্টা করে, সেই ব্রাহ্ম অপরাধী যে কঠোর সাধন করে। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাঁচ মিনিট চেষ্টা করিতে হয়, তখন সংশয় হইবে হৃদয় বিকৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মযোগী বিলম্ব করেন না, পরিশ্রম করেন না, যোগানন্দ সম্ভোগ তাঁহার নিকটে জল পান করার ন্যায় সহজ। যেমন তিনি বসিলেন তৎক্ষণাৎ যোগ হইল, তাঁহাকে কষ্ট করিতে হইল না, চেষ্টা করিতে হইল না। সন্তরণ শিখিতে চাও, গা ছাড়িয়া দাও, সহজ অবস্থায় সন্তরণ শিখিতে পারিবে। যদি সন্তরণে আয়াস প্রকাশ করিয়া জলে আঘাত কর, সন্তরণ করিতে পারিবে না, জলমগ্ন হইয়া যাইবে। যদি যোগী হইতে চাও আপনাকে সহজাবস্থায় ছাড়িয়া দাও, টানাটানি করিয়া কিছু হইবে না। সহজাবস্থায় আপনাকে ছাড়িয়া দিলে ফল লাভ হইবে, ব্রহ্ম তোমার বক্ষে সহজে তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করিবেন। হে মনুষ্য, আধ্যাত্মিক অবস্থা সহজ এবং স্বাভাবিক। শরীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় প্রকাণ্ড যোগের ব্যাপারও সহজ। সহজ অবস্থায় থাকিয়া সহজ উপায় অবলম্বন কর, সমুদয় বিকৃত পরিশ্রম দূর করিয়া দাও। জলে নামিলে যেমন সহজে ডোবা যায়, তেমনি ব্রহ্মেতে ডুবিতে পারিবে, পক্ষীর ন্যায় সহজে উর্দ্ধে উড়িয়া যাইবে। সহজ পথে চল, স্বভাবের উপর নির্ভর কর, ঈশ্বর তোমাকে আশ্চর্য্য সুধাপান করাইবেন।

ঈশ্বরের শত্রু।

রবিবার, ৪ঠা ফাল্গুণ, ১৮০১ ; ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮০।

সৌভাগ্যক্রমে এত দিনের পরে ব্রাহ্মসমাজ অবিভক্ত হইল। এত দিনের পর সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হইল, সকল ধর্ম্ম এবং সকল সত্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইল। নববিধানের অভ্যুদয়ে অবিভক্ত সত্যের জয় হইল। ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত শাখা প্রশাখা একীভূত হইল। এই নববিধানে সমস্ত সাধু ভাবের সম্মিলন হইল, সমস্ত পথিক ঘরে ফিরিয়া আসিল। সকল ভ্রম কুসংস্কার দূর হইল, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আবার এক হইল। যে দিন নববিধান রূপ সুকুমার প্রসূত হইল, সেই দিন হইতে সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইল। তিন শাখাতে যে সমাজ বিভক্ত হইয়াছিল সেই সমাজ আপনার ভিতরে সামঞ্জস্য স্থাপন করিল। ব্রাহ্মসমাজের নাম আর ব্রাহ্মসমাজ রহিল না, ব্রাহ্মের নাম ব্রাহ্ম রহিল না। দেশাচারের জন্য এই দুই নামের বাহ্যিক অংশ পড়িয়া রহিল, বাস্তবিক তাহার মধ্যে প্রাণ নাই। ব্রাহ্মসমাজ নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই, কেবল ঈশ্বরের ধর্ম্ম রহিল এবং ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধানভুক্ত লোকেরা রহিলেন।

স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ আর রহিল না, যত ধর্ম্ম ছিল সে সমুদয় ধর্ম্মের ঐক্য স্থাপিত হইল, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে এক স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রহিল না। সকল দেশ সকল জাতি একীভূত হইল।

এক বিধাতা, এক বিধান, এক মনুষ্য প্রকৃতি, এক সত্য, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় আপন আপন বিশেষ লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এক সার্ব্বভৌমিক সমাজে পরিণত হইল। হিন্দুসমাজ, খ্রীষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি সমুদয় সমাজ এক ঈশ্বরের পরিবারে পরিণত হইল। প্রকৃত বিশ্বাসীর রাজ্যে ভিন্নতা, অনৈক্য, অথবা কলহ বিবাদ নাই। বিশ্বাসী অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেন সকল ধর্ম্ম এক হইল। এক ঈশ্বর, এক পরিবার এক ধর্ম্ম, যাহারা এক ঈশ্বরের উপাসক তাহারা সকলেই এক পরিবারভুক্ত। আর যাহারা এক ঈশ্বর বিরোধী তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ। যদি বল যেমন অন্যান্য ধর্ম্ম সমাজ, ব্রাহ্মসমাজও সেইরূপ স্বতন্ত্র সমাজ, তাহা হইলে তোমরা বিধান বিরোধী। কোন মনুষ্য সমাজকে ব্রাহ্মসমাজ বলিও না। যেখানে বিধাতা ঈশ্বর স্বহস্তে ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন সেইস্থানে যথার্থ বিধান ভূমি।

এই বিধানভুক্ত লোকেরা ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বরের নিঃশ্বাস তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করে। স্বয়ং ভগবান্ যাহা করেন তাহাই তাঁহাদিগের ক্রিয়া। এই বিধান ভূমির বহির্ভাগে যে সকল মনুষ্য আছে তাহারা ঈশ্বর এবং বিধানের শত্রু। এই বিধানের ভিতরে আমাদিগের শ্রদ্ধেয় এবং ভক্তিভাজন পরলোকবাসী মহাত্মাগণ রহিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্ম, য়িহুদী ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমুদয় ধর্ম্ম এই বিধানের অন্তর্গত। সুতরাং যাহারা বাহিরে

দাঁড়াইল তাহারা ঈশ্বরের শত্রু এবং কেবল শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপাসক। সৃষ্টি অবধি এই পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে তৎসমুদয় এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যাহারা এই বিধানের বহির্ভূত তাহারা ঈশ্বর এবং তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্মের বিরোধী, ঈশার বিরোধী, চৈতন্যের বিরোধী এবং অন্যান্য সাধু মহাত্মাদিগের বিরোধী।

যাহারা এইরূপে জ্ঞান ভক্তির বিরোধী তাহারা নিশ্চয়ই অবিদ্যা কুবুদ্ধি এবং পাপ প্রবৃত্তির অধীন। ইহারা আপন আপন সুবিধা মত হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান অথবা ব্রাহ্ম ইত্যাদি সকল হইতে পারে। ইহারা আপনাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম পথের নেতা করিয়াছে। স্বেচ্ছাচার অথবা ব্যাভিচার ইহাদিগের ধর্ম্ম। চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর এবং তাঁহার আনুগত্য ইহাদিগের শত্রু, শরীর পূজা এবং ইন্দ্রিয়সেবা ইহাদিগের দৈনিক সাধন। ধন এবং সাংসারিক সুখ ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। যাঁহারা সত্য ভাবে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের উপাসনা করেন ইহারা তাঁহাদিগের তেজ সহ্য করিতে পারে না। নিরাকার ঈশ্বর ইহাদিগের নিকটে মিথ্যা অথবা কল্পনা, পরলোক এবং আত্মার অমরত্ব ইহাদিগের পক্ষে বাতুলের স্বপ্ন। আত্মার উন্নতির দিকে ইহাদিগের দৃষ্টি নাই। মাংসের নরকে, মাংসের দুর্গন্ধে ইহারা বাস করে। ইহারা মাংস পূজা করে। কিরূপে শরীর পুষ্ট হইবে, কিরূপে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিবে এই ইহাদিগের চিন্তা, ইহাই ইহাদিগের

সাধন। ইহাদিগের পাপাচার বিনাশ করিবার জন্যই এই বঙ্গদেশে বর্ত্তমান নববিধানের অভ্যুদয় হইয়াছে।

বঙ্গদেশ যুদ্ধস্থল, বঙ্গদেশে যত নাস্তিক, যত ব্যভিচারী, এবং যত ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই বিধান বিরোধী; যাহাতে বিধানের জয় না হইতে পারে তাহারা প্রাণপণে এই চেষ্টা করিতেছে। যাহাতে নর নারী উপাসনা না করে, ব্রহ্মস্তব না করে, ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ না করে, অধিকক্ষণ ব্রহ্মধ্যান না করে এই তাহাদিগের চেষ্টা। ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলেও বাস্তবিক ব্রাহ্ম নহে, ইহারা ঈশ্বরের শক্র। ইহারা হিন্দু বা ব্রাহ্ম কিছুই নহে। ইহারা যদি শুনিতে পায় কেহ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন অথবা সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া কোন কার্য্য করেন, তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া ইহারা তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া বধ করিতে উদ্যত হইবে। ঈশ্বরের নাম ইহারা সহ্য করিতে পারে না। ইহারা কোন মতেই মনে করিতে পারে না যে, স্বর্গের ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আসিয়া সামান্য মনুষ্যদিগের অভাব সকল মোচন করিতেছেন। স্বয়ং প্রভু ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, বিধাতা হইয়া, নূতন বিধান লইয়া, পৃথিবীতে আসিয়াছেন; ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না। তাহারা বলে, "কি আমাদের এই মলিন পৃথিবীতে ঈশ্বর আসিবেন?"

এই উনবিংশ শতাব্দীতে তাহারা ঈশ্বরকে পৃথিবীতে

আসিতে দিবে না। তাহারা মনে করে ইহলোক পরলোকের মধ্যে যে সেতু ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার মধ্যে যোগ নাই। এখন আর কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, এবং ঈশ্বরের কথা শুনিতে পায় না। তাহাদিগের মতে ঈশ্বরের সাধ্য নাই যে, এ সকল নাস্তিকদিগকে পরাস্ত করিয়া এই পৃথিবীতে আসেন। এই সকল বীরপুরুষেরা ঈশ্বরকে দূর করিয়া দিয়া আপনারা কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। আপনারাই আপনাদিগের কর্ত্তা এবং পরিত্রাতা। সমুদয় সৎকার্য্যের সাধুবাদ ইহারা আপনারাই গ্রহণ করে ; কিছুতে গৌরব স্বীকার করিতে চায় না। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর বিহীন হইয়া আপনাপন প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি অনুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহারা ঈশ্বরের ভয়ানক শত্রু সুতরাং বিশেষ বিধানের বিরোধী।

কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের হস্তে তাঁহাদিগের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনের সমুদয় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান ; সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের আদেশে সম্পন্ন করেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যাহা কিছু ধর্ম্ম সঙ্গত তৎসমুদয় ঈশ্বরের কার্য্য। এই বিশ্বাসীদিগের যে সমাজ তাহাই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ এবং এই ব্রাহ্মসমাজ অবিভক্ত অর্থাৎ ইহার মধ্যে কোন বিভাগ কিম্বা সম্প্রদায় হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট যে সকল লোক আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা অবিশ্বাসী

অর্থাৎ ঈশ্বরের শত্রু, অবিশ্বাসের কাল কলঙ্কে কলঙ্কিত। ইহারা যে সকলেই গুরুতর পাপে পাপী তাহা নহে, কেন না ইহারা সময়ে সময়ে সত্যের জয় হউক ধর্ম্মের জয় হউক, ইচ্ছা করে; কিন্তু ঈশ্বর যে বিধাতা হইয়া নিতান্ত কলঙ্কিত মনুষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা মানে না।

ইহাদিগের অনেক সদ্গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহারা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অথবা বিশেষ বিধান বিশ্বাস করে না। সুতরাং ইহারা যদি প্রবল হয় তাহা হইলে নাস্তিকতা এবং স্বেচ্ছাচার প্রবল হইবে, এবং ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইবে। ইহাদিগের নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া অল্প বিশ্বাসী সাধক সকল উপাসনা কমাইয়া দিবে, এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগ করিতে অধিক যত্নবান হইবে। পৃথিবীতে এরূপ অবিশ্বাসী-দিগের সংখ্যাই অধিক। প্রকৃত বিশ্বাসী অতি অল্প। লক্ষ লক্ষ আমাদিগের শত্রু। যাহারা ব্রাহ্মনাম ধারণ করিয়াছে, অথচ বিশেষ বিধান মানে না, তাহারা ব্রাহ্মসমাজের শত্রু। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরাও যদি নববিধান বিশ্বাস না করেন, তাঁহারাও প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজের শত্রু। অতএব সমুদয় নাম উপাধির বিবাদ বিলুপ্ত হইল। যে কেহ ঈশ্বরের বিধান অস্বীকার করেন, তিনি ঈশ্বরের বিরোধী। ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ যত অবিশ্বাসী আসিয়াছে, তাহারা অন্যান্য অবিশ্বাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইল এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে সকল বিশ্বাসী আছেন পৃথিবীর

অন্যান্য বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের ঐক্য হইল। এই যে বিশ্বাসীদিগের ঐক্য ইহারই নাম নববিধান।

পৃথিবীর সমুদয় সাধু এই নববিধানের অন্তর্গত। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিশ্বাসী, যোগী, ভক্ত এবং কর্ম্মী তাঁহারা সকলেই নববিধানভুক্ত, সুতরাং নববিধানকে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ নাম দিতে পারি? কি হিন্দুসমাজে, কি মুসলমান সমাজে, যিনি শুদ্ধতার নেতা অথবা যথার্থ যোগী, তিনি এই নববিধান রাজ্যে একজন প্রধান লোক। অতএব নববিধান-রূপ নবকুমারের জন্ম হইবামাত্র ধর্ম্মরাজ্যের সকল বিরোধ চলিয়া গেল, শান্তির রাজ্য, কুশলের রাজ্য সমাগত হইল। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্মের নিশান উড়িয়াছে সে সমস্ত নববিধানের নিশান। এবং মনুষ্য সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ধর্ম্মবিধানের বিরুদ্ধে, যাহারা দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহারা সকলেই ঈশ্বরের শত্রু। এক দিকে বিশ্বাস, অন্য দিকে অবিশ্বাস, এক দিকে ঈশ্বরের বন্ধুগণ, অন্য দিকে ঈশ্বরের শত্রুগণ।

হরি যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাইতেছেন। আমরা তাঁহার হাতের যন্ত্র। তাঁহাকে লাভ করিয়া, আমরা তাঁহার সমস্ত সাধুকে লাভ করিলাম! পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধুগণ আমাদিগের ঘরে আসিলেন। আর আমাদিগের ঘরের দুষ্ট অসাধুরা বাহিরে চলিয়া গেল। মনের বিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, কে ব্রাহ্ম নহে, ইহা বুঝা যায় না।

প্রকৃত বিশ্বাসীরা আমাদিগের বন্ধু। ব্রহ্মমন্দিরে কয়জন যথার্থ বিশ্বাসী আছ পরিষ্কার হইয়া বাহিরে এস। আর খানিক বিশ্বাস খানিক অবিশ্বাস, খানিক গেরুয়া বস্ত্র, খানিক সংসারের বস্ত্র লইয়া থাকিও না। প্রাণ মন সমস্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শরণাগত হও। পরিষ্কার একটী দল হউক। মিথ্যাবাদী হইবার প্রয়োজন নাই। সংসার ছাড়িয়া, উপধর্ম্ম ছাড়িয়া নূতন বিধানের আশ্রয় গ্রহণ কর। ইহপরলোকে যত সাধু ভক্ত বাস করিতেছেন, তাঁহারা তোমাদিগের বন্ধু। বিনীত এবং বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদিগের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কর।

সাধুর রক্ত মাংস পান ভোজন।

রবিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮০।

কোন ব্রহ্মভক্ত সাধু পৃথিবী পরিত্যাগ করিবার সময় তাঁহার আপন অনুগত প্রিয়তম শিষ্যদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন, যদি তোমরা আমাকে স্মরণ করিতে চাও তবে আমার মাংস আহার করিও এবং রক্ত পান করিও। এই অলৌকিক কথা অলৌকিক ভাবে পূর্ণ। সামান্য বুদ্ধি দ্বারা এই কথা বুঝা যায় না। এই কথার ভাব লইয়া উক্ত সাধুর শিষ্য প্রশিষ্যেরা কত বিবাদ করিতেছেন। বাস্তবিক স্বর্গীয় মহাত্মাদিগকে গ্রহণ করিবার একমাত্র উপায় তাঁহাদিগের

রক্ত মাংসকে আমাদিগের রক্ত মাংসে পরিণত করা। ভক্তকে যদি বলি, "হে ভক্ত, আমি তোমার মত হইব, সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণ করিব।" এই সকল কথায় ভক্তের তুষ্টি হয় না। যথার্থ হরিভক্ত মনুষ্যের নিকট পূজা অথবা গৌরব চাহেন না। অনেক প্রশংসা বাক্য বলিলে ভক্তের চিত্তরঞ্জন হয় না। তুমি প্রভু, তুমি কর্ত্তা, এ সকল কথা বলিলে ভক্ত তৃপ্ত হন না। ভক্ত পৃথিবীর প্রশংসা প্রার্থী নহেন প্রশংসা পূজা দ্বারা ভক্ত বশীভূত হন না। ভক্তকে লাভ করিবার উপায় স্বতন্ত্র। যখন পৃথিবী ঈশ্বরের নিকট বহু স্তব করিয়া এই কথা বলিল,—"হে ঠাকুর, আমার মধ্যে যে সকল ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা স্বর্গে চলিয়া গেলেন, সেই সাধু সন্তানগুলিকে বিদায় দিয়া আমি বড় দুঃখিত আছি, শুনিয়াছি তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাঁহারা এখন স্বর্গকে আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন, অতএব যদিও তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন যাহাতে তাঁহাদিগকে অন্তরে দেখিতে পাই, এরূপ বর দাও।" ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "পৃথিবী, আমি তাঁহাদিগকে তোমার ক্রোড়ে দিব; কিন্তু তাঁহাদিগকে রাখিবে কোথায়? তাঁহারা অশরীরী অতীন্দ্রিয়, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহারা গৃহীত হইবেন না, বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ভক্তি দ্বারা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবে না; কিন্তু আমি এই বর দিলাম তুমি তাঁহাদিগকে পাইবে।"

পরলোকগত সাধুদিগকে পৃথিবী কিরূপে পাইবে? পৃথিবী সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগকে নিকটে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু এখনও পৃথিবী সম্যক্‌রূপে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহলোক পরলোকের কিরূপে যোগ হইবে পৃথিবী ইহা বুঝিতে পারে না। পরলোকবাসী মহাত্মারা দেশ কালের অতীত। সুতরাং কোন বিশেষ স্থানে অথবা কোন বিশেষ সময়ে যে আমরা তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিব তাহার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা জলে কিম্বা স্থলে কোথায়ও দেখা দিবেন না, তাঁহারা দিবসে কিম্বা রাত্রিতে কাহারও নিকটে আসিবেন না, জ্ঞান কিম্বা ভাব দ্বারা কেহই তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, তবে কিরূপে আমরা তাঁহাদিগকে পাইব? মনুষ্যের বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে লাভ করিবার যত উপায় ছিল সমুদয় বিফল হইল, সকল দিক অন্ধকার হইল, আশার প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল, তবে এই যে বিধাতা বলিলেন, "পৃথিবী, তুমি পরলোকগত সাধুদিগকে পাইবে।" এই কথা কি মিথ্যা প্রবঞ্চনা? ঈশ্বর কি প্রবঞ্চনা করিতে পারেন? অল্প বিশ্বাসী পৃথিবী ঈশ্বরের এই বরের অর্থ বুঝিতে পারে না। বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধান ইহার গূঢ় অর্থ বুঝাইয়া দিতে আসিয়াছেন। ইহলোক পরলোকের যোগ, পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের যোগ দেখাইয়া দিবার জন্য, স্বর্গ হইতে এই নববিধানের প্রকাশ।

এই কথা মনে করিবামাত্র ঐ প্রাচীন ঋষির কথা স্মরণ

হইল। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়া গেলেন যদি আমাকে দেখিতে চাও, তবে আমার রক্ত মাংস পান ভোজন করিবে। বাস্তবিক ভক্তদিগকে দেখিতে হইলে কোথায় যাইব? কিরূপে তাঁহাদিগকে দেখা যায়? আমরা জানিয়াছি কোন দেশে কিম্বা কোন স্থানে তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, অথবা আমাদের বুদ্ধি কিম্বা ভক্তি দ্বারাও তাঁহাদিগকে লাভ করিতে পারি না, তবে কিরূপে তাঁহাদিগের দর্শন পাইব? এই প্রশ্ন মনে হওয়াতে উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ হইল। তাঁহার কথানুসারে বলিতেছি, বন্ধুগণ, যদি সাধু দর্শন করিতে চাও, তবে জলে স্থলে দেখিও না, এখানে ওখানে বাহিরে দেখিও না, সাধু অন্তরের ধন, তাঁহাকে আপনার রক্ত মাংসের মধ্যে দেখ। যাঁহারা ইন্দ্রিয় গোচর হন না, বুদ্ধিতে আসেন না, আমাদের ভাবেতেও ধৃত হন না, তাঁহারা রক্ত মাংসের ভিতরে দেখা দিবেন। সাধুদিগকে বাহিরে রাখিলে তাঁহাদিগের অবমাননা হয়।

যদি বল, শ্রীচৈতন্যকে স্মরণ করিলে নয়ন হইতে ভক্তি জলধারা পড়ে, শাক্যমুনির গাম্ভীর্য্য এবং তীব্র বৈরাগ্য স্মরণ করিলে শরীর মন স্তম্ভিত হয়, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলে না। স্বর্গবাসীদিগের নাম স্মরণ করিয়া ভক্তির অশ্রুপাত করিলে স্বর্গের অপমান হয়। স্বর্গবাসীগণ তোমাদের ভাব চান না, ভাব চক্ষের জলে নিঃশেষ হইয়া যায়; তাঁহারা তোমাদিগের জীবনে, তোমাদিগের চরিত্রের মধ্যে

স্থান চান। অর্থাৎ যেখান হইতে মনুষ্যের তেজ, জীবন, স্বভাব, চরিত্র বাহির হইতেছে, পরলোকবাসী সাধুগণ সেখানে বাস করিতে ভালবাসেন। যদি তাঁহাদিগকে নিজের রক্ত মাংসের মধ্যে অর্থাৎ নিজের চরিত্র ও জীবনের মধ্যে স্থান না দাও তবে তাঁহাদিগের প্রতি সহস্র প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেও তাঁহারা তোমাদের হইবেন না। হে ব্রাহ্ম, স্বর্গীয় সাধুদিগকে তুমি বাহিরে মনে করিয়া আত্ম-প্রবঞ্চিত হইলে। তোমার অনুরাগে আর্দ্র হৃদয় হইতে সাধুদিগের নামে কত কোমল স্তব স্তুতি বাহির হইল; কিন্তু তোমার নিকটে একজন সাধুও আসিলেন না। আর দেখ যে ব্রাহ্ম জীবনের শিরা দিয়া ভক্তকে ডাকিলেন, তিনি তাঁহার সেই শিরার জালে ভক্তকে বান্ধিলেন। হে ভক্ত ব্রাহ্ম, তুমি যাঁহাকে যথার্থ ভক্ত বলিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত ভালবাসিলে তাঁহাকে তুমি কোথায় রাখিলে? জ্ঞানেতে না ভাবেতে? না, তুমি ভক্তকে পুস্তকে কিম্বা সাময়িক ভাবেতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না। যদি ভক্তকে যথার্থই ভালবাস তবে তাঁহাকে রক্ত মাংসের মধ্যে রাখিতে হইবে।

ভক্তকে ভালবাসিলে তোমার জীবন ভক্তের জীবন, তোমার রক্তমাংস ভক্তের রক্তমাংস হইবে, তোমার শোণিত-ধারে ভক্তের রক্ত প্রবাহিত হইবে। তোমার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত ভক্তের অধিকৃত হইবে। তোমার প্রত্যেক রক্ত

বিন্দু "ভক্তের জয়" "ভক্তের জয়" এই কথা বলিতে বলিতে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। যদি কেহ তোমার মুণ্ড কাটে তাহা হইলে তোমার সেই কাটা মুণ্ডও "ভক্তের জয়" "ভক্তের জয়" বলিতে থাকিবে। যদি যথার্থই ভক্তের হইতে চাও তবে ভক্ত আর তুমি এক হইয়া যাইবে। তুমি যতক্ষণ বলিবে এই সাধু আর এই আমি, ততক্ষণ তুমি সাধুকে গ্রহণ কর নাই, ততক্ষণ সাধুর সঙ্গে তোমার যোগ হয় নাই, ততক্ষণ তুমি সাধু হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছ। যদি সাধুর সঙ্গে একীভূত হইতে চাও, তবে সাধুর রক্তমাংস পান ভোজন করিতে হইবে, সাধুর জ্ঞান ভক্তি তোমার জ্ঞান ভক্তি হইবে, সাধুর উৎসাহ তেজ তোমার উৎসাহ তেজ হইবে। তাঁহার প্রতিদিনের শুদ্ধতা বৈরাগ্য, শান্তভাব, তোমার শুদ্ধতা বৈরাগ্য শান্তভাব হইবে। তুমি সাধুকে, বাহিরে জলে স্থলে অথবা আকাশে দেখিলে না, কোন বিশেষ সময়ে তাঁহাকে দেখিলে না, কিন্তু অনন্তকালসাগরে ভাসিতে ভাসিতে তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলে। যে বাহিরে সাধুকে দেখিতে চায় সে সাধুর অপমান করে। বাহিরের অসার শরীর পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু ভিতরের আত্মার চরিত্রে আত্মার জীবনের মধ্যে ভক্তগণ চিরকাল বাস করিবেন। বর্ত্তমান নববিধান এই সত্য পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিতেছেন। নববিধান অন্য প্রকার সাধন চাহেন না। যখন আমাদিগের জীবনে এইরূপে সাধুদিগের জীবন বৃদ্ধি পাইবে তখন পৃথিবীতে স্বর্গের জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে। *

উপকারী শত্রু।

রবিবার, ৯ই চৈত্র, ১৮০১ শক ; ২১শে মার্চ্চ ১৮৮০।

বর্ত্তমান সময়ে হরির যে সকল আশ্চর্য্য প্রেম লীলা আমরা সকলে দর্শন করিতেছি ও সম্ভোগ করিতেছি সে সকল এক সময়ে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে। এখন আমরা এই সকল দেখিয়া ও ভোগ করিয়া সুখী হইতেছি, ভবিষ্যতে লোকে এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া সুখী হইবে। আজ যাহা দর্শন হইতেছে ভবিষ্যতে ইহা স্মৃতি হইবে। বংশ পরম্পরায় এই হরিলীলা কথা সকলের কাছে চলিয়া যাইবে ; কিন্তু ধন্য তাঁহারা যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে এই লীলারস আস্বাদন করিতেছেন ! ভগবান এখন তাঁহার সাধক দলকে সঙ্গে লইয়া নিত্য নূতন লীলা করিতেছেন। প্রত্যেক মাসে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতিদিন এখন নূতন ব্যাপার হইতেছে। হরিলীলারস কথা সুমিষ্ট কথা। ভগবান পৃথিবীতে যতবার বিশেষরূপে আপনার প্রেমরস প্রকাশ করিয়াছেন ততবার মনুষ্যকুল মুগ্ধ হইয়া লেখনী ধারণপূর্ব্বক সে সকল বৃত্তান্ত ইতিহাসে, পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

ভগবানের এমনই আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ যে, কেহ না কেহ তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভগবানের বন্ধু, ভাগবতে তাঁহাদিগের নাম ত থাকিবেই। আবার যাহারা হরির শত্রু তাহাদিগের নামও চিরস্মরণীয় হইবে। যাঁহারা

অনুকূল হইয়া হরিলীলার সহায়তা করিতেছেন পৃথিবীতে তাঁহাদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভবিষ্যদ্বংশ তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিবে। আবার যাহারা হরির বিরোধী হইয়া হরিলীলার প্রতিকূলাচরণ করিতেছে, ইতিহাসে তাহাদিগের নামও লিখিত হইবে। যাহারা ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্ম-বাণী শ্রবণ, প্রত্যাদেশ, বিশেষ বিধান, প্রকৃত বিশ্বাস, বৈরাগ্য, যোগ, ধ্যান, ভক্তির প্রমত্ততা এবং সংসারে যোগসাধন প্রভৃতির বিরোধী, তাহাদিগের নামও হরিলীলা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিবে। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশ জানিতে পারিবে কে কে হরির বন্ধু ছিলেন, এবং কে কে হরির শত্রু ছিল।

যাঁহারা সত্যানুসন্ধান করেন তাঁহাদিগের জানা উচিত কে সত্যের বন্ধু এবং কে সত্যের শত্রু, কে সত্যের নিশান উড়াইলেন এবং কে সত্যের নিশান কলঙ্কিত করিল, কে অর্থাদি সাহায্য দ্বারা প্রচারকদিগের জীবন রক্ষা করিলেন এবং কেবা ইচ্ছা করিল প্রচারকদিগের শরীর মন জীর্ণ শীর্ণ এবং শুষ্ক হইয়া সত্য প্রচার অবরুদ্ধ হউক। যাঁহারা ষোল আনা যোগ, ধ্যান, ভক্তি বৈরাগ্যের অনুকূল, ইতিহাসে যেমন তাঁহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হইবে; সেইরূপ যাহারা ইচ্ছা করে সুমিষ্ট উপাসনা ভক্তি তিরোহিত হউক, তাহা-দিগের নামও ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইবে। তোমরা আমরা হয় ত তাহাদিগকে ঈশ্বর বিরোধী নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা

করিতে পারি : কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের শত্রু মিত্র উভয়েরই নাম ভবিষ্যৎ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে। কেবল কি ভবিষ্যদ্বংশের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য ধর্ম্মের ইতিহাসে ধর্ম্মবিরোধীদিগের নাম লিখিত থাকিবে? না, তাহা নহে। তোমরা জান ছবি আঁকিতে হইলে কাল লাল উভয়ই আবশ্যক।

হে তত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্ম, যদি তুমি ঈশ্বরের লীলা অধ্যয়ন করিয়া থাক, যদি ঈশ্বরের প্রেমের ইঙ্গিত বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই জান শত্রুদিগের প্রতিকূল আচরণ ভিন্ন সতেজে ব্রহ্মরাজ্য বিস্তৃত হয় না। সমস্ত প্রতিকূল ভাবগুলি একত্র হইয়া ঘনীভূত না হইলে অল্পবিশ্বাসী জগৎ ঈশ্বরের দুর্জ্জয় প্রতাপ অনুভব করিতে পারে না। যদি ধর্ম্মজগতে শত্রু না থাকিত তাহা হইলে ধর্ম্মবীরেরা ঘোরতর কালনিদ্রায় অভিভূত হইতেন। পথ নিষ্কণ্টক হইলে তেজে ধর্ম্মের রথ চলে না। যখনই রথের গতির প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তখনই ধর্ম্মবীরদিগের উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক ধর্ম্মবিধানের উন্নতির জন্য সংগ্রাম আবশ্যক। যতই শত্রুরা তুমুল সংগ্রাম করে ততই গভীরতর সিংহরবে মেদিনী কাঁপাইয়া ধর্ম্মবীরেরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিরোধ ভিন্ন বীরের বীর্য্য প্রকাশ হয় না।

যদি সমুদ্রের ভয়ানক গর্জ্জন শুনিতে চাও, তবে অনেক দূর যাইও না, সমুদ্রের তীরের নিকট উপবেশন কর। সেখানে

শুনিবে ঝপাং ঝপাং শব্দ হইতেছে। পাথর এবং তীর সমুদ্রকে বাধা দেয়, এই জন্য সমুদ্র আস্ফালন করিয়া সে সকল বাধা অতিক্রম করে। সেইরূপ যখন সাধুজীবন সিন্ধুর সমক্ষে বাধা বিপত্তি পড়ে তখন সেই সমুদ্রের ভয়ানক পরাক্রম প্রকাশিত হয়। অতএব শত্রুর নিতান্ত প্রয়োজন। যেমন মেঘাচ্ছাদিত পূর্ণ চন্দ্র মেঘ বিদীর্ণ করিয়া আপনার সুন্দর জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করে, সেইরূপ শত্রুদিগের দ্বারা আক্রান্ত ধর্ম্মবীরেরা সেই শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগের দুর্জ্জয় বিশ্বাসের পরাক্রম প্রদর্শন করেন। শত্রুদিগের উৎপীড়ন ভিন্ন সাধকদিগের মনে কত তেজ এবং কত শক্তি আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

যদি বল শত্রুরা একবার আক্রমণ করিলেই ত সাধকদিগের বলবীর্য্য পরীক্ষিত হয়, বারম্বার শত্রুগণ দ্বারা ধর্ম্মবীরগণ আক্রান্ত হইবেন, ইহা কি হওয়া উচিত? বারম্বার রাক্ষসকে সাধুদিগের রক্ত দান করিবার প্রয়োজন কি? হাঁ, বারম্বার রাক্ষসের উপদ্রবের প্রয়োজন আছে। রাক্ষসেরা উৎপাত না করিলে সাধু তপস্বীদিগের তেজ প্রকাশিত হয় না। যেমন বিধান তাহার শত্রুদলও সেইরূপ হয়। যদি একটী বিধানে একটী সত্য প্রচার করা অথবা একটী ফুল প্রস্ফুটিত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটী দত্রুদল দ্বারাই সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যে বিধানে এক শত পুষ্প প্রস্ফুটিত করিতে হইবে, সেই বিধান পূর্ণ

করিবার জন্য এক শত দল শত্রু আবশ্যক। শত্রুতা ভিন্ন মনুষ্যের গূঢ় শক্তি সকল প্রকাশিত হয় না।

অন্ধবিশ্বাসী দুশ্চরিত্র পৃথিবী শাক্যমুনি, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতির বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ না করিলে আজ পৃথিবীতে তাঁহাদিগের এত দূর প্রাদুর্ভাব হইত না। প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে পৃথিবী বিধিমতে নির্যাতন করিয়াছে। সুতরাং যে বিধানে সমুদয় সাধুদিগের সম্মিলন হইবে, যাহাতে সমস্ত ধর্ম্ম এবং সমস্ত সাধুতা একত্র হইবে, সেই বিধানের প্রতি কেমন ভয়ানক শত্রুতা হওয়া উচিত। অসার সংসারাসক্ত পৃথিবী সত্য প্রচার হইতে দেয় না, ফুল ফুটিতে দেয় না। আবার যদিও নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এক একটী সত্যফুল প্রস্ফুটিত হয়, নীচাসক্ত পৃথিবী সে সকল একত্র করিয়া মালা গাঁথিতে দেয় না। বর্ত্তমান বিধান পৃথিবীর সমুদয় বিধান পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীতে ঈশা শাক্য, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের যত শত্রু আছে সমুদয়ই এই বিধানের শত্রু।

এই বিধান বিশ্বাস বৈরাগ্য, যোগ ধ্যান, প্রেম ভক্তি ও সংসারে যোগ সাধন প্রভৃতি সমস্ত একীভূত করিবার জন্য প্রেরিত। অতএব যাহারা এ সমুদয়ের বিরোধী, তাহারা সকলেই এই বিধানের শত্রু। ব্রাহ্ম, তুমি যদি শাক্যমুনির প্রশংসা কর, কিম্বা তুমি যদি ঈশা মুসার নামে উৎসব কর,

যাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরোধী তাহারা তোমার শত্রু হইবে। ব্রাহ্ম, তোমার মস্তকের উপর প্রকাণ্ড বিধানের গুরুতর ভার, তুমি যদি মনে করিতে অতি সামান্য এবং অল্প কার্য্য করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিবে তাহা হইলে তোমার শত্রু সংখ্যা অতি অল্প হইত; কিন্তু যখন তুমি একটী প্রকাণ্ড বিধানভুক্ত হইয়াছ, যখন তুমি মনে করিয়াছ ঈশা মুসার ন্যায় বিশ্বাসী হইবে, সক্রেটিসের ন্যায় আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হইবে, শাক্যের ন্যায় বৈরাগী হইবে, প্রধান আর্য্য যোগী ঋষিদিগের ন্যায় ধ্যানপরায়ণ সচ্চরিত্র সাধু হইবে তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোক তোমার শত্রু হইবে। যতদিন তোমাদের অল্প উন্নতি ছিল ততদিন তোমাদের কম শত্রু ছিল। অতএব কেহই শত্রুকে ভয় করিও না। মহানন্দ সদানন্দ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া শত্রুদল পরাস্ত কর।

জয় লাভ করিবার সঙ্কেত শিখাইয়া দিতেছি। যে বিষয়ের জন্য লোকে তোমাদিগের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিবে, গাঢ়তর অনুরাগ এবং উৎসাহের সহিত সেই বিষয় সাধন করিবে। যদি তোমরা দুই ঘণ্টা উপাসনা কর বলিয়া, উপাসনার বিরোধী লোকেরা তোমাদিগকে উপহাস করে, তাহা হইলে তোমরা তিন ঘণ্টা উপাসনা করিবে। যদি তোমরা এক ঘণ্টা ধ্যান কর বলিয়া ধ্যানের শত্রু অল্পবিশ্বাসী লোকেরা তোমাদের প্রতি বিরক্ত হয়, তাহা হইলে তোমরা দুই ঘণ্টা ধ্যান করিবে। দুই জন কিম্বা তিন জন সাধুর নামে উৎসব

করিয়াছ বলিয়া সাধু বিদ্বেষী লোকেরা তোমাদিগের উপরে "নরপূজার" দোষারোপ করে, তোমরা জাতীয় বিজাতীয় পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগের নামে উৎসব করিবে। দুইজন সাধুকে গ্রহণ করিলে যদি পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক তোমাদের শত্রু হয়, তাহা হইলে তোমরা সেই সমস্ত সাধুদিগকে গ্রহণ করিবে যাহাতে সমস্ত পৃথিবী তোমাদের শত্রু হয়।

ঈশ্বরের ধর্ম্ম পূর্ণ করিবার জন্য নানা স্থান হইতে শত্রু আসিবে। দলে দলে শত্রুরা তোমাদিগকে মাতাল বলিবে, পাগল বলিবে, ধূর্ত্ত বলিবে, অল্পবিশ্বাসী নাস্তিক বলিবে; কিন্তু এ সকল শত্রুরা তোমাদিগের উপকার করিবে। যেমন আখ্যায়িকায় উল্লেখ আছে রাম জন্মিবার পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রত্যেক বিধান গঠিত হইবার পূর্ব্বে সেই বিধানের শত্রু মিত্রদিগের নাম লিখিত থাকে। হে নববিধানভুক্ত ব্রাহ্ম, তুমি বিশ্বাস কর ঈশ্বরের সাধু সন্তানদিগকে অশ্রদ্ধা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, ইহাতে সাধুবিরোধীরা তোমার শত্রু হইবে।

তুমি বিশ্বাস কর, সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে গমন করিলে ঈশ্বরের ধর্ম্ম সাধন করা হয় না; কিন্তু সংসারেই যোগ সাধন করা আবশ্যক, ইহাতে কর্ত্তব্যবিরোধী অলস ব্যক্তিরা তোমার শত্রু হইবে। তুমি বিশ্বাস কর আত্মচিন্তা, আত্মজ্ঞান, ধ্যান যোগ ভিন্ন কেবল বাহিরের কার্য্য স্রোতে ভাসিলে জীবন স্থির হয় না, ইহাতে যাহারা ধ্যান বিরোধী তাহারা তোমার

শত্রু হইবে। তুমি বিশ্বাস কর ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানেরও প্রয়োজন, ইহাতে যাহারা জ্ঞানের বিরোধী, তাহারা তোমাকে জ্ঞান চর্চ্চা করিতে দেখিলে ঈর্ষা করিবে। অতএব সর্ব্বদাই শত্রুদিগের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরের বাগানের মালী তাঁহারা যত্নের সহিত শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে সেই বাগানের পুষ্প সকল রক্ষা করিবেন এবং প্রস্ফুটিত করিবেন। নববিধানের অর্থ এই, অভিপ্রায় এই।

নববিধান বিবিধ ধর্ম্মবিধান হইতে সত্যপুষ্প সকল সঙ্কলন করিয়া একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মালা গাঁথিবে। বিধানভুক্ত বন্ধুগণ, এই মালা গাঁথিবার জন্য তোমরা আহুত হইয়াছ। অতএব শত্রুতা মিত্রতার উপরে দৃষ্টি না রাখিয়া তোমরা তোমাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যাও। এই শুভ সময়ে যাহারা তোমাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করিবে তাহাদিগের নামও চিরস্মরণীয় হইবে। তাহারা না বুঝিতে পারিয়া অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগের প্রাণের ভক্তিপদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া দিবে। এ সকল উপকারী শত্রুদিগের নাম যদি মানুষ ভবিষ্যৎ ইতিহাস মধ্যে না লেখে, স্বয়ং ভগবান লিখিবেন, কেন না শত্রুদলের শত্রুতা ভিন্ন তাঁহার বন্ধুদিগের গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ভক্তদিগের প্রতি ঈশ্বরের এমনই নিগূঢ় করুণা যে তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশলে শত্রুরাও তাঁহার ভক্তদিগের উপকার করে। অতএব যাহারা তোমাদিগকে পাগল,

মাতাল বলিয়া গালাগালি দিবে, তোমরা তাহাদিগের সেই গালাগালির উপযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা কর। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

অনিত্যের মধ্যে নিত্য।

রবিবার, নিশীথ, ৩০শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ১১ই এপ্রেল ১৮৮০।

সমুদ্রের জল চলিতেছে, তেমনই কাল চলিতেছে। সমুদ্রের জল চলিতেছে; কিন্তু সমুদ্রের মধ্য হইতে যে পর্ব্বত আকাশের দিকে উঠিয়াছে তাহা অচল। সেইরূপ কাল সমুদ্র দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু দেব দেব মহাদেব অনন্তকাল সাগরে স্থির ভাবে অটল হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। যদি জলে পড়ি মরিলাম, যদি পাহাড় ধরিলাম স্থির শান্ত হইলাম। কাল সমুদ্রের ভয়ানক ঢেউ পৃথিবীর সমুদয় বস্তু চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। কালের আঘাতে কত পিতা মাতা পুত্র শোকে কাঁদিতেছে, কত বিধবা পতি বিয়োগে এবং কত পিতৃ মাতৃহীন, পিতৃমাতৃ বিয়োগে কাঁদিতেছে। কাল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বীরদিগকেও লইয়া যাইতেছে। কালের করালগ্রাসে সমুদয় সৃষ্ট বস্তু চূর্ণ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধক সকল পাহাড় ধরিয়া বাঁচিয়া গেল। ক্ষুদ্র দুর্ব্বল সাধক শক্ত পাথর ধরিয়া ভবসাগরের ঢেউকে ফাঁকি দিল তাহারা অনন্ত ঈশ্বরের পদাশ্রয় পাইয়া নির্ভয় হইল। যেখানে

সময়ের অধিকার নাই মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব তাহাদিগকে সেখানে ডাকিয়া বসাইলেন। যেখানে সময়ের অধিকার সেখানে মৃত্যুর আধিপত্য।

এক একটী বৎসর প্রকাণ্ড কাল সমুদ্রের উপরে এক একটী ঢেউয়ের ন্যায়। পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল আবার নূতন বৎসর আসিল। সমুদয় ঢেউগুলি একে একে চলিয়া গেল। একে একে সমুদয় বৎসর এবং সমস্ত শতাব্দী চলিয়া যাইবে, থাকিবেন কেবল তিনি, যিনি কালের অতীত মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের মন্দিরের বাহিরে বৎসর চলিয়া যায়, কালের পরিবর্ত্তন হয় এবং সমস্ত আন্দোলিত হয়; কিন্তু মহাদেবের মন্দিরের ভিতরে কাল প্রবেশ করিতে পারে না। মন্দিরের ভিতরে মহাদেব মহেশ্বরের হিমালয়। এখানে অনন্ত কালের জন্য মহাদেব স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। এই প্রকাণ্ড পর্ব্বতে যাঁহারা আশ্রয় পাইয়াছেন তাঁহারাও ধন্য।

বৎসর আসিল এবং গেল, পৃথিবীর লোকেরা ইহা দেখিয়া কাঁদে; কিন্তু অনন্ত রাজ্যে যাঁহারা থাকেন কালের পরিবর্ত্তনে তাঁহাদিগের কোন দুঃখ হয় না। মুখে করিয়া যেমন ব্যাঘ্র আপনার শিকার লইয়া যায়, সেইরূপ কাল আপনার মস্তকে করিয়া সমস্ত অসার বস্তু লইয়া যায়। বন্ধুগণ, সাবধান যেন কালের ঢেউ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। চল আমরা সকলে ব্রহ্মের বুকের ভিতরে যাই। সেখানে কাল অথবা মৃত্যুর অধিকার নাই। যাও কাল, তুমি চলিয়া যাও। মহা-

দেবের লোকগুলিকে তুমি স্পর্শ করিতে পার না। হে পুরাতন বর্ষ, যেমন তোমার ভাইগুলি একে একে গিয়াছে সেইরূপ তোমারও জীবন ফুরাইল; কিন্তু আমাদের জীবন ফুরায় নাই। আমরা যাইব না। মৃত্যুঞ্জয়ের শরণাগত আমরা, তিনি আমাদিগকে কালের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন।

যেমন পদ্মানদী প্রকাণ্ড নগর নগরী সকল গ্রাস করিয়া লইয়া যায়, তেমনই এই কাল কত মানুষকে বগলে লইয়া যাইতেছে। কাল সমুদ্র মানুষগুলোকে বগলে লইয়া ডাকিতে ডাকিতে, হুঙ্কার করিতে করিতে চলিল। ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কত লোকের সম্পদ, কীর্ত্তি আমোদ প্রমোদ চলিল। তরঙ্গের সঙ্গে সকলে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। কত শত শত বৎসরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল টানিয়া লইয়া চলিল। কালের গ্রাসে যে পড়িবে সে মরিবে। কাল সমুদ্র ঘন মেঘের ন্যায় ভয়ানক গাঢ় নীল কাল। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কাল চক্র ঘুরিতেছে, কাল সমুদ্র চলিতেছে। কাল কাহারও কথা শুনে না। যেমন যম নিদারুণ, কাল তেমনি নিষ্ঠুর। কাল কিছুতেই আপনার শিকারের বস্তু ছাড়ে না। যেমন জলে জল মিশিয়া যায় তেমনি বৎসরের সঙ্গে বৎসর মিশিয়া যায়। এই পুরাতন বৎসর অনেক আস্ফালন করিয়া অসংখ্য লোককে মারিয়া এখন আপনি মরিবার জন্য চলিল। কাল গেল, বর্ষ শেষ হইল; কিন্তু মহাদেবের মন্দির টলিল না।

[ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল]

ঢেউ চলিয়া গেল, অসার বস্তু অসার কালের সঙ্গে বিলীন হইল; ছায়া বাজী শেষ হইল। ইতিহাসের একটী পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল। কালের খেলা কে বুঝিবে? এক বৎসর গেল, আর এক বৎসর আরম্ভ হইল। একখানি পুস্তক লেখা হইল। ভাগ্যবান্ তাঁহারা যাঁহারা কালের হাতে পড়িলেন না। ধন্য ব্রহ্মমন্দির, তুমি যেমন স্থির তেমনি রহিলে। তুমি স্থির আছ ব্রহ্মমন্দির, তোমার সৌভাগ্যের অন্ত নাই। তুমিও ধন্য, আমরাও ধন্য। তোমার মধ্যে থাকিয়া আমরাও কালের সমুদয় আন্দোলন অতিক্রম করিলাম। আমরা যাঁহার ক্রোড়ে আশ্রিত তিনি কালাতীত ব্রহ্ম মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার পদতলে ঘর করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা থাকে না। অতএব যেমন বৎসর কাল সমুদ্রে মিশিয়া গেল, সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষুদ্র জীবাত্মা ঢেউ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমাত্মার মধ্যে সম্মিলিত হইয়া যাক।